

নবীজি

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

কেমন ছিলেন

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

নবীজি কেমন ছিলেন

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

নবীজি

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

কেমন ছিলেন

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক আলেমে দীন

ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

নবীজি কেমন ছিলেন

রচনা	মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী
প্রথম রাহনুমা প্রকাশ	এপ্রিল, ২০১৮
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়রি, ১৯৯৬
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
প্রুফ সমন্বয়	বীক্ষণ
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০।
একমাত্র পরিবেশক	রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯।

মূল্য : ১৮০/- (একশো আশি টাকা মাত্র)

NABIZI KEMON CHILEN (SW.)
Writer. Obaydur Rahman Khan Nadawi. Published by. Rahnuma Prokashoni.
Price. Tk. 180.00, US $ 04.00 only.

ISBN 978-984-92213-4-0
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : rahnumabd.com

অর্পণ

ফুলের বুকে গন্ধ সম
ছড়িয়ে আছ বুকে মম,
তোমার ব্যথা প্রিয়তম,
তারি দোলা লাগে।

.....

না দেখা হে প্রিয় আমার,
বুকে বেদন জাগে—

.....

চোখের পানির এই দরিয়ায়
কেঁদে কেঁদে খুঁজি তোমায়,
কেন আমি জন্মিনি, হায়
তোমার যাওয়ার আগে!

.....

পূর্বলেখা

আব্বার কাছে আমার *শামায়েলে তিরমিযী* পড়ার সৌভাগ্য হয়। উনিশশো তিরাশি খৃস্টাব্দে যখন কিশোরগঞ্জ আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়ায় আমি দাওরায়ে হাদীস পড়ি, আব্বা তখন এই কিতাবের ক্লাস নিতেন। শামায়েল অর্থ : রূপ-সৌন্দর্য, চরিতামৃত, আকৃতি-প্রকৃতি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েল সম্পর্কিত যত বর্ণনা পাওয়া যায়, এসবের বিশুদ্ধতম চয়ন ইমাম তিরমিযীর এই কিতাব।

কঠিন আরবী শব্দ ও পরিভাষার ব্যাখ্যা, মর্ম ও তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে আব্বা (আতাউর রহমান খান নদভী রহ.) যখন তুলনামূলক জটিল অথচ সংবেদনশীল, প্রিয় অনুভূতিঋদ্ধ এ অধ্যায়টি পড়াতেন, তখন আমার কিশোরমনে যুগপৎ আনন্দ ও বেদনার উপলব্ধি দোলা দিত। ভাবতাম, আমি তো খেটেখুটে এসব বর্ণনা বোঝার মতো অবস্থায় পৌঁছে গেছি; কিন্তু যাদের পক্ষে দীর্ঘ দিন আরবী ও ইসলামী বিদ্যা শিক্ষাচর্চা সম্ভব হয় না, তাদের পক্ষে এসব প্রেমময় বর্ণনা পড়া ও উপভোগ করা কি আদৌ সম্ভব! বাংলা ভাষায় অতি সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জলভাবে যদি এসব বর্ণনা পরিবেশন করা যেত, তা হলে তো আগ্রহী প্রতিটি মুসলমানই এর স্বাদ গ্রহণ করতে পারতেন। সেদিনের অঙ্কুরিত চিন্তাটুকুই আজ দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় (বর্তমানে প্রায় ৩৫ বছর) পর বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ!

লেখাপড়ার সাথে সার্বক্ষণিকভাবে যুক্ত হলেও এ সংবেদনশীল বিষয়ে কোনো কিছু লেখার সাহস আমার ছিল না। বহুবার শুরু করেও বেশি দূর এগোতে পারিনি। শুরুটা কোনখান থেকে হবে, কোথায় গিয়ে শেষ হবে ইত্যাদি ভেবে ভেবে কাজ আটকে গেছে বারবার। এরই মধ্যে দৈনিক *আজাদের* বহু পুরনো এক সীরাতুন্নবী জামীমায় শামায়েলুন্নবী বিষয়ক একটি ছোট্ট লেখা পড়ে আমার ধারণা একটা দিক খুঁজে পায়। ধীরে ধীরে আমার চিন্তা আরও পরিশীলিত হয়। একসময় বিসমিল্লাহ বলে কাজে হাত দিই।

ইতোমধ্যে শিক্ষা ও কার্যোপলক্ষে দেশ-বিদেশের নানা অঙ্গনের সাথে পরিচিত হই। ক্রমে আমার পড়াশোনার পরিধি বেড়ে চলে। নজরে আসে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর লিখিত আরবী, উর্দু ও অন্যান্য ভাষার ঐতিহাসিক রচনা, প্রাচীন ও আধুনিক পুস্তক এবং উৎস-গ্রন্থসমূহ। কুরআন-হাদীস, সিয়ার ও তাওয়ারীখে শামায়েল ও খাসায়েল সম্পর্কিত প্রতিটি বাণী ও তথ্য এ দৃষ্টি নিয়ে সন্ধান শুরু করার পর যেন বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। অতি ধীরলয়ে বিনির্মিত হয় প্রিয়তম নবীজির আকৃতি-প্রকৃতি, রূপ-সৌন্দর্য আর চরিত্রমাধুরীর প্রীতিময় উপস্থাপনার এক স্বপ্নিল অবকাঠামো। না-দেখা এ প্রিয়তমের কদম মোবারকে ঠাঁই লাভের আকুল আবেগ নিয়ে এ কাজটি সম্পাদিত হয়েছে। এর উসিলায় যদি আমার, আমার আব্বা-আম্মা ও নিকটজনদের ইহ-পরলোক কল্যাণময় হয়ে ওঠে, তবেই আমার সকল পাওয়া পূর্ণ হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রীতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে চাওয়ার তো আর কিছুই নেই!

ঢাকা
২৭শে রমযান ১৪১৬
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

বিনীত–
উবায়দুর রহমান খান নদভী

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, বহুবছর পর বইটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হলো। নানা কারণে কিছুকাল লেখালেখি ও প্রকাশনা থেকে খানিকটা দূরে সরে থাকতে হয়। রাহনুমার আগ্রহ ও সাথীদের উৎসাহে নতুন করে পুরোনো এসব বই আবার প্রকাশিত হলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে সব ধরনের কল্যাণে ভরপুর করে দিন।

বিনীত
উবায়দুর রহমান খান নদভী

মতিঝিল, ঢাকা
২০ মার্চ, ২০১৮

সূচি

পবিত্র নাসিকা—১৫
পবিত্র মুখ—১৫
পবিত্র মুখের লালা—১৬
পবিত্র হাসি—১৭
পবিত্র কণ্ঠস্বর—১৯
পবিত্র অলঙ্কারপূর্ণ বাণী—২০
সুসংক্ষিপ্ত ঋদ্ধ বাক্য—২১
মস্তক মোবারক—২১
পবিত্র কেশরাজি—২১
প্রসঙ্গ : খেযাব—২৩
দাড়ি মোবারক—২৫
গর্দান শরীফ—২৭
মোবারক স্কন্ধদ্বয়—২৮
পবিত্র বক্ষ—২৮
পূতপবিত্র কলব—২৯
পূতপবিত্র উদর—২৯
পবিত্র বক্ষকেশ—৩০
বগল মোবারক—৩০
পিঠ মোবারক—৩১
মোহরে নবুওয়াত—৩১
পবিত্র বাহুদ্বয়—৩৪
পবিত্র পদযুগল—৩৬
পায়ের গোছা মোবারক—৩৭
পবিত্র অঙ্গসৌষ্ঠব—৩৮
পবিত্র শরীরের রঙ—৩৮

পবিত্র পদবিক্ষেপ—৪০
হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুশবু—৪১
পবিত্র স্বেদ ও দেহবর্জ্যসমূহের সুঘ্রাণ—৪১
পবিত্র হস্তের সুঘ্রাণ—৪৪
নবীজি কেমন ছিলেন—৪৫
যে ছবি যায় না আঁকা—৪৬
কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার—৪৭
পোশাক-পরিচ্ছদ—৫০
পানাহার—৫১
দিবা-রাত্রির কার্যসূচি—৫২
বিছানা ও আসবাবপত্র—৫৩
বাসস্থান—৫৩
চাঁদের চেয়েও সুন্দর!—৫৪
অন্তিম লগ্ন—৫৬
পবিত্র অনুভব!—৫৮
রাসূলুল্লাহর অনুপম দেহাবয়ব—৫৯
প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনন্য বৈশিষ্ট্য—৭২
শ্রেষ্ঠ চরিত্র—৭৩
সহনশীলতা ও ক্ষমা—৭৪
ধৈর্য ও স্থৈর্য—৭৫
মহাবিজয়ের দিন—৭৬
প্রকৃতিগত সুস্থতা—৭৬
অঙ্গীকার পালন—৭৭
বীরত্ব—৭৮
অল্পে তুষ্টি ও তাওয়াক্কুল—৭৯
স্বভাবগত বিনয়—৮০
সততা ও বিশ্বস্ততা—৮০
নম্রতা—৮১

অনাবিল অন্তর—৮৪
স্নেহ-মমতা—৮৪
ত্যাগ ও ধৈর্য—৮৪
সংসার-নির্লিপ্ততা ও সংযমশীলতা—৮৮
আল্লাহর ভয়—৮৯
অন্তরের কোমলতা—৮৯
করুণা ও দয়ার্দ্রতা—৯০
আল্লাহর দাসত্ব—৯১
আল্লাহ তাআলার সঙ্গ—৯৩
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারিদ্র্য—৯৪
অনন্য বৈশিষ্ট্য—৯৭
সহনশীলতা ও ক্ষমা—৯৯
পরকালচিন্তা—১০০
স্বভাবগত বিষয়াদি—১০০
উদ্বেগ—১০৫
প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সৌন্দর্য—১০৫
প্রিয় নবীজির বদান্যতা—১০৭
রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিষ্ণুতা—১১১
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঔদার্য ও ক্ষমা—১১৪
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহাহ ওয়াসাল্লামের বীরত্ব ও শৌর্য—১১৫
পরিবারবর্গের সাথে অন্তরঙ্গ পরিবেশে—১১৬
বিপদসঙ্কুল অবস্থায় অগ্রণী ভূমিকা পালন ও সুসময়ে সংযম—১১৭
আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক—১১৯
স্বভাবগত মিতাচার ও অনুপম রুচিশীলতা—১২৫

নবীজি কেমন ছিলেন

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

পবিত্র নাসিকা

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাসিকা মোবারক এত নূরানি এবং উজ্জ্বল ছিল যে, কোনো দর্শক ভালোভাবে খেয়াল করে না দেখলে সাধারণত এরকমই দেখতে পেত যে, তাঁর নাসিকা মোবারক উন্নত; কিন্তু আসলে তা অতিরিক্ত উঁচু বা উন্নত ছিল না, বরং নূরের তাজাল্লির ফলে এরকম উঁচু মনে হতো। অধিকন্তু এ দৃশ্যমান উচ্চতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও পরম নেকবখতির দ্যুতি পরিস্ফুটিত হতো।

পবিত্র মুখ

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ মোবারক সম্পর্কে হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে *সহীহ মুসলিমে* এরূপ বর্ণনা এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশস্ত মুখগহ্বরের অধিকারী ছিলেন। এরকম বর্ণনা *শামায়েলে তিরমিযী*তে হযরত ইবনে আবি হালা রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস শরীফে পাওয়া যায়।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশস্ত মুখগহ্বরের অধিকারী ছিলেন বলে তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী হতো ভরাট স্বরবিশিষ্ট।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে যে বাণী বের হতো, তা ছিল নেহায়েত সম্পন্ন ও ভরাট বাক্যের সমাহার। তিনি কখনো অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতেন না। তিনি ছিলেন নিতান্তই স্পষ্টভাষী।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সর্বদাই ঠোঁটের কাছাকাছি থাকত। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাথে বিলম্ব করে তিনি কিছু বলতেন না।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের দাঁত উজ্জ্বল, শুভ্র ও প্রশস্ত ছিল।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের দাঁত উজ্জ্বল ও চকচকে ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওষ্ঠযুগল প্রশস্ত ছিল। যখন তিনি কথোপকথন করতেন, তখন এরকম দেখা যেত, যেন ওষ্ঠযুগলের ফাঁক দিয়ে সামনের দাঁত থেকে নূরের ঝিলিক বেরোচ্ছে।

ইমাম তাবরানী রহ. *আওসাত* নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওষ্ঠদ্বয় এবং মুখগহ্বরের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ সমগ্র মানবজাতির চেয়ে বেশি ছিল। এক বর্ণনায় আছে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দন্ত মোবারক পরিমিত বড় ছিল—অর্থাৎ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ সৌন্দর্যের দিক দিয়ে পূর্ণ ও প্রকৃষ্ট ছিল।

পবিত্র মুখের লালা

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের লালা রোগীদের জন্য পূর্ণ শেফা ছিল। হাদীস শরীফে আছে, খায়বারের যুদ্ধের দিন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চোখে যন্ত্রণা হচ্ছিল, তখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুখের লালা মোবারক তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সুস্থ হয়ে গেলেন।

অন্য এক ঘটনা। একদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি পানির মশক আনা হলো। তিনি সেখান থেকে এক আঁজলা পানি নিয়ে কুলি করে উক্ত মশকের মধ্যে ফেলে দিলেন। এরপর উক্ত

মশকের পানি যখন কূপে ফেলা হলো, তখন তার পানি থেকে কস্তুরির সুঘ্রাণ ছড়াতে লাগল।

একদা হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কূপের পানিতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র মুখের লালা মোবারক ফেলে দিলেন। এরপর দেখা গেল, মদীনা শরীফের সমস্ত কূপের পানির চেয়ে উক্ত কূপের পানিই অধিক সুপেয় আর সুস্বাদু হয়ে উঠেছিল।

একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কতিপয় দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আনা হলো। তিনি স্বীয় মুখের লালা মোবারক তাদের মুখে দিলেন। অতঃপর শিশুগুলো এতই পরিতৃপ্ত হলো যে, সারাদিন তারা আর দুধই পান করল না।

ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু একদা অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়লেন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জিহ্বা মোবারক তাঁর মুখের ভেতর পুরে দিলেন। প্রিয় দৌহিত্র নানাজানের জিহ্বা মোবারক চুষতে লাগলেন। সমস্ত দিন তিনি আর ক্ষুৎপিপাসা অনুভব করলেন না। এ ধরনের অসংখ্য মোজেযা রয়েছে।

পবিত্র হাসি

সহীহ বুখারী শরীফে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো জোরে অট্টহাসি দিতে দেখেননি—যাতে মুখের কণ্ঠতালু দৃষ্টিগোচর হয়।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওষ্ঠাধরে সর্বদাই মৃদু হাসি লেগে থাকত। কোনো কোনো হাদীসে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তিনি এত বেশি হাসতেন না, যাতে নাওয়াজেয দাঁত দৃষ্টিগোচর হয়। চোয়ালের শেষ প্রান্তের দাঁতকে 'নাওয়াজেয' বলা হয়।

ওপরের বর্ণনা কোনো ব্যক্তির অত্যধিক হাসাহাসি করার একটা উদাহরণমাত্র। এখানে নাওয়াজেয বলতে আক্কেল দাঁত বোঝানো হয়নি, বরং সাধারণ দন্তপাটিকেই বোঝানো হয়েছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসি 'মৃদু হাসি'ই ছিল। আওয়াজবিহীন বড় হাসিকে জিহক বলা হয়। আর জিহকের প্রাথমিক অবস্থা মুচকি হাসি; এতে খুশির প্রাবল্য যদি বেশি থাকে, তবে কখনো কখনো দু'একটি দাঁত প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক;—এরূপ অবস্থায় যদি আওয়াজ বিদ্যমান থাকে, তবে তাকে বলা হয় কাহ্কাহা বা অট্টহাসি; নিঃশব্দে হাসলে এবং এতে দাঁত প্রকাশ পেলে তাকে বলে জিহক; আর যদি একেবারে শব্দ না থাকে এবং দাঁতও বের না হয়, তবে সে হাসিকে 'তাবাস্সুম' বা মৃদু হাসি বলে। *সাররাহ* নামক কিতাবে আছে, ওষ্ঠদ্বয় মিলিত থাকা অবস্থায় যে হাসি হয়, তাকে তাবাস্সুম বলে। তবে তাবাস্সুম বা মুচকি হাসির এ সংজ্ঞাই সমধিক প্রসিদ্ধ যে, নিঃশব্দ হাসিতে দাঁতের শুভ্রতা ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হয়।

হযরত শায়খ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ থেকে বিশেষতর অবস্থার অধিকাংশ হাসি তাবাস্সুম বা মুচকি হাসি ছিল। তবে এটা হতে পারে যে, কখনো কখনো তিনি জিহক হাসি হেসেছেন, কিন্তু তাই বলে জিহকের সীমা অতিক্রম করেননি আর কাহ্কাহা বা অট্টহাসির তো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, অট্টহাসি অপছন্দনীয়। অধিক হাসাহাসি করলে বা জিহক হাসির আধিক্যে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন হয়।

ইমাম বায়হাকী রহ. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাসতেন, তখন পার্শ্ববর্তী দেয়াল আলোকিত হয়ে যেত এবং তাঁর পবিত্র দাঁতের নূরে দেয়াল সূর্যরশ্মির ন্যায় ঝিলিক মারত। তিনি যখন ক্রন্দন করতেন, তখনও এরূপ অবস্থা হতো। ক্রন্দনের সময় আওয়াজ উচ্চ হতো না। পবিত্র চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হতো। তামার ডেকচির ভেতর ফুটন্ত পানির শব্দের মতো পবিত্র বক্ষাভ্যন্তর থেকে একধরনের বিশেষ শব্দ শোনা যেত।

কোনো কোনো বর্ণনায় তাকে যব ভাঙানোর চাকা ঘূর্ণনের আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর এরকম ক্রন্দন কখনো নিজের দুঃখ-যাতনার জন্য হতো না। তিনি কাঁদতেন আল্লাহ তাআলার প্রবল পরাক্রান্ত সিফাতের

গভীরতা অনুধাবনের কারণে, উম্মতের প্রতি অপার স্নেহ-মমতা বা কোনো মৃতের তরে আল্লাহ তাআলার রহমত কামনা করার জন্যে। তিনি যখন তন্ময় হয়ে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতেন অথবা কোনো কোনো সময় রাতে নামায আদায় করতেন, তখন এমন করুণ অবস্থার উন্মেষ ঘটত। নবীজি কখনো হাই তুলতেন না;—হাই তোলা দৈহিক অবসন্নতার বহিঃপ্রকাশ। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বে এরকম অবস্থা আদৌ ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ কাজটি থেকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন।

কোনো কোনো বর্ণনা এরকমও আছে, কোনো নবীই কখনো হাই তোলেননি। এক হাদীসে এরকম আছে, হাই শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে। কারও যদি হাই প্রবল হয়ে যায়, তা হলে বাম হাতের পিঠ মুখের ওপর স্থাপন করতে হবে অথবা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরতে হবে। হাই তোলার সময় আলস্যসূচক কোনো শব্দ মুখ থেকে বের করা খুবই অপছন্দনীয় কাজ।

এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি হাই তুলে আওয়াজ বের করে, শয়তান তার মুখের ভেতর থেকে হাসাহাসি করতে থাকে।

পবিত্র কণ্ঠস্বর

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর ছিল সীমাহীন প্রীতিপূর্ণ। তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত ধ্বনি ও তার মাধুর্য অন্য সকল আওয়াজের চেয়ে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ছিল। তাঁর চেয়ে সুন্দর আওয়াজ ও মিষ্টি কথার কোনো মানুষ পৃথিবীতে আসেননি। তাঁর রসনা মোবারক মাখরাজ থেকে শব্দ বের করে এনে যথাযথ উচ্চারণ করতে যেমন সক্ষম ছিল, তেমনি ছিল তাঁর বাক্যে সঠিকত্ব, বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। আজ পর্যন্ত কেউই উক্ত গুণাবলি অর্জনে সক্ষম হননি।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবীকেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেননি, যাঁর কণ্ঠস্বর ও বাক্যাবলি সুন্দর ছিল না। আর উক্ত গুণাবলির দিক দিয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বাগ্রে।

অন্য কোনো মানুষের কণ্ঠ যেখানে পৌঁছুতে ব্যর্থ হতো, সেখানে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ধ্বনি বিনা বাধায় পৌঁছে যেত—বিশেষ করে নসিহত, সতর্কীকরণ বা সুসংবাদ-সম্বলিত বক্তৃতায়। সুতরাং পর্দার অন্তরালে নারীসমাজও সে আওয়াজ শুনতে পেত। পবিত্র হজ সম্পাদনকালে মিনা প্রান্তরে তিনি যে খুতবা প্রদান করেছিলেন, সে খুতবা সমস্ত লোকের কর্ণকুহরে পৌঁছে গিয়েছিল। দূরের ও কাছের সবাই আপন অবস্থানে থেকেই সে খুতবা শুনতে পেয়েছিলেন।

পবিত্র অলঙ্কারপূর্ণ বাণী

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক থেকে উচ্চারিত ভাষার অলঙ্কার, গভীর ভাবসম্পন্ন বাক্য, আশ্চর্য ধরনের প্রকাশভঙ্গিমা, বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি তাঁর মধ্যে এত বিপুল ছিল যে, কেউ এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁর তুলনীয় হতেও সক্ষম নয়।

একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো কখনো বিদেশে তাশরিফ নিয়ে যাননি বা মানুষের সঙ্গে তেমন ওঠা-বসা করেননি, তা সত্ত্বেও এরূপ অলঙ্কৃত ভাষা আপনি কোত্থেকে লাভ করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের ভাষা ও পরিভাষা, যা বিলুপ্ত ও নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আর আমি সেগুলো রপ্ত করে নিয়েছি। তদুপরি তিনি বলেছেন, আমার রব আমাকে আদব শিখিয়েছেন। অতএব, আমাকে তিনি সর্বোৎকৃষ্টরূপে শিষ্ট, পরিশীলিত ও মার্জিত করেছেন। আদবের বাচনিক পর্যায়ে অলঙ্কারযুক্ত কথা এবং স্থান-কাল ও পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত বাক্যপ্রয়োগ বা হৃদয়স্পর্শী ভাষণও এর সাথে সম্পৃক্ত।

তিনি আরও এরশাদ করেছেন, আমার প্রতিপালন হয়েছে বনী সাদ ইবনে বকর গোত্রে—অর্থাৎ, এটি ছিল তাঁর ধাত্রীমাতা হযরত হালিমা সাদিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর গোত্র। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সমস্ত আরবে ভাষার বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে ছিলেন।

এক বর্ণনায় আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আরবী বর্ণকে তার মাখরাজ বা উচ্চারণস্থল থেকে উচ্চারণকারীদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ—অর্থাৎ, আমার মতো সঠিক উচ্চারণ আর কেউ করতে পারে না।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেহায়েত পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। এমন পরিষ্কার করে বলতেন যে, প্রতিটি শব্দ পৃথক পৃথকভাবে গণনা করা সম্ভব হতো। কথোপকথনকালে কখনো সন্দেহ বা দুর্বোধ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তিনি একেকটি শব্দ তিন-তিনবার করে উল্লেখ করতেন।

সুসংক্ষিপ্ত ঋদ্ধ বাক্য

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কথামালার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি স্বয়ং এরশাদ ফরমান, আমাকে জামে কালামের বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে এবং আমার জন্য কালামকে সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। 'জামে কালাম'-এর অর্থ হচ্ছে, এমন শব্দসম্বলিত বাক্য, যা সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত অথচ অধিক অর্থবহ।

মস্তক মোবারক

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মস্তক প্রসঙ্গে হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক বড় ছিল। এক্ষেত্রে মাথাকে বড় বলার উদ্দেশ্য এ কথা বোঝানো যে, হযরতের মাথা ক্ষুদ্রাকৃতির ছিল না। তাঁর দেহের অন্যান্য অঙ্গের মতো মাথা পরম নান্দনিক ও নিরুপম ছিল, যেমন অন্যান্য অঙ্গ সম্পর্কে অনুপম সৌষ্ঠবের কথা বলা হয়েছে। মাথা বড় হওয়া ধীশক্তির প্রাচুর্য, মর্যাদাবান প্রধান অঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মনন ও মেধার পরিপূর্ণতার পরিচায়ক।

পবিত্র কেশরাজি

হযরত কাতাদা রহ. বলেন, আমি হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কেশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করেছিলাম। তিনি বললেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল নরম বা মোলায়েম ছিল। চুল মোবারক সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনায় 'সাবত' শব্দ এসেছে, যার অর্থ নরম ও ঝুলন্ত চুল।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হুযুরের চুল কোঁকড়ানো ও শক্ত ছিল না।

তাঁর মাথার চুল কানের মধ্যখান পর্যন্ত লম্বা ছিল। অন্য বর্ণনা পাওয়া যায় কান পর্যন্ত; অন্য আরেক বর্ণনানুসারে দু'কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিল; তা ছাড়া কাঁধ পর্যন্ত বা প্রায়-কাঁধ পর্যন্ত—এরূপ বর্ণনাও আছে। এরূপ বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান হয়েছে এভাবে—হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো চুলে তেল ব্যবহার করতেন বা চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াতেন, তখন চুল লম্বা হয়ে যেত; আর অন্য সময় তার বিপরীত থাকত। অথবা চুল যখন লম্বা হয়ে যেত, তখন কাঁধ পর্যন্ত থাকত; আবার যখন চুল ছোট করে ফেলতেন, তখন খাটো হয়ে উপরোক্ত দু'টো পর্যায়ে চলে যেত।

মাওজমাউল বিহার কিতাবেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনা দ্বারা আরেকটি ব্যাপারে জানা গেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চুল কর্তন করতেন, মস্তক মুণ্ডন করতেন না। আর মস্তক মুণ্ডন করার ব্যাপারে তিনি স্বয়ং এরশাদ করেছেন যে, তিনি হজ ও ওমরা ব্যতীত মস্তক মুণ্ডন করতেন না। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

হযরত উম্মে হানী রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে মক্কা মুয়াযযামায় তাশরিফ আনলেন, তখন তাঁর মাথা মোবারকের চুল চার ভাগে বিভক্ত হয়ে ঝুলে ছিল। মাথার চুল লম্বা রাখা সুন্নত। তবে উপরোক্ত প্রচলন বহু প্রাচীন কাল থেকেই আরবদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তবে এক্ষেত্রে চুলের প্রতি লক্ষ্য রাখা, তেল ও চিরুনি ব্যবহারের মাধ্যমে চুলের যত্ন নেওয়া অপরিহার্য। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কেশরাজিতে যথেষ্ট পরিমাণে চিরুনি করতেন। কারও মাথার চুল আলুথালু ও অবিন্যস্ত থাকা তিনি পছন্দ করতেন না। কারও চুল এমন থাকলে তাকে

লক্ষ্য করে এরূপ বলতেন, তুমি কি কখনো তাকে (শয়তানকে) দেখেছ? তিনি অতিমাত্রায় পরিপাটি করা লম্বা চুলও অপছন্দ করতেন। সুবিন্যস্ত মধ্যম প্রকারের চুলই বেশি পছন্দ করতেন। চুলে তেল ও চিরুনি ব্যবহারে অক্ষম ব্যক্তির জন্য খাটো করে চুল রাখাই উত্তম।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আমি মাথার চুল ওই সময় থেকে দুশমন মনে করতাম, যখন থেকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, প্রত্যেক চুলের ফাঁকেই নাপাকি থাকে। পরবর্তী সময়ের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ বিশেষ করে মাশায়েখ, দরবেশ ও আবেদ বান্দাগণের ভেতর চুল খাটো করে রাখার যে রীতি, তার কারণ সম্ভবত এটাই। তারা অনেকেই চুলে তেল-চিরুনি ব্যবহার করতে অক্ষম ছিলেন;—এ কাজের জন্য তাদের ফুরসতই মিলত না অথবা তারা নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনে সতর্কতার পথ বেছে নিতেই সচেষ্ট ছিলেন।

প্রসঙ্গ : খেযাব

দাড়ি বা চুলে খেযাব (কলপ) ব্যবহার করা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তবে অধিকাংশের মতে বিশেষ করে মুহাদ্দিসগণের মতে এটা মাকরুহ। কেননা, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বার্ধক্যে উপনীত হননি, যাতে তাঁর খেযাব ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। ইন্তেকালের সময় তাঁর কেশরাজিতে এবং দাড়ি মোবারকে সতেরো বা আঠারোটি চুল সাদা হয়েছিল। তাও আবার তিনি চুলে তেল ব্যবহার করে তা আঁচড়ালে সেগুলো ঢাকা পড়ে যেত।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মাথা ও দাড়ি মোবারকে মাত্র গুটিকতক চুল সাদা হয়েছিল; আমি ইচ্ছা করলে তা গণনা করতে পারতাম। তিনি আরও বলেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেযাব ব্যবহার করেননি।

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝরে-পড়া চুল মোবারক, যা হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট রক্ষিত ছিল, তা খেযাবকৃত

ছিল বলে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন, চুলগুলো আসলে খেযাবকৃত ছিল না; বরং কোনো প্রকারের খুশবু দিয়ে সেগুলোকে সুগন্ধিযুক্ত করা হয়েছিল। বাহ্যিকভাবে দেখা যেত, যেন খেযাব লাগানো হয়েছে; অথবা এও হতে পারে, পরবর্তীতে হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু সে কেশ মোবারকগুলো খেযাব করে রেখে দিয়েছিলেন।

হযরত উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বেলায়ও উক্ত সমাধানটি প্রযোজ্য। *মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া* কিতাবে *বুখারী* ও *মুসলিম শরীফ* থেকে হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জরদ রঙ ব্যবহার করা অবস্থায় দেখেছেন। এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন, জরদ রঙ বলতে এখানে জাফরানকে বোঝানো হয়েছে, যা সুগন্ধির জন্য ব্যবহার করতেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, আমি হযরত শায়খ আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী রহ. থেকে এরূপ শুনেছি যে, উক্ত জরদ রঙটি খেযাব ছিল না। কেননা, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশরাজি তো কৃষ্ণবর্ণই ছিল। আর চুলের কৃষ্ণতা তো অন্য কোনো রঙকে ধারণ করে না। কাজেই তিনি জরদ বর্ণ ব্যবহার করেছেন তা ছিল জাফরান, যা দিয়ে চুল ধৌত করে পরিষ্কার করেছেন। তবে যে ক'টি দাড়ি সাদা ছিল, তা অবশ্যই কৃষ্ণবর্ণকে ধারণ করে নিয়েছে আর হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার্ধক্যে খেযাব ব্যবহার করেছেন। কাজেই এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। আর তিনি (আবদুল ওয়াহাব মুত্তাকী) ইমাম নববী থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো খেযাব ব্যবহার করতেন। তবে অধিকাংশ সময়ই চুল বা দাড়িকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতেন। কাজেই বর্ণনাকারীগণ তাঁকে যখন যে অবস্থায় দেখেছেন, সেরূপই বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের বর্ণনাই সঠিক।

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুপক্ষের দৃষ্টিতে পুরোপুরি যৌবন, শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। কেননা, দীনের দৃঢ়তা অর্জনের জন্য এবং ইসলামের শান-শওকত প্রকাশের

ক্ষেত্রে উক্ত গুণাবলির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে নবুওয়াতের যামানায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তাআলা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বার্ধক্য থেকে সংরক্ষিত করেছেন। কেননা, বার্ধক্য হচ্ছে দুর্বলতা ও অক্ষমতার নিদর্শন। আর হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাহাবাগণকে খেযাব ব্যবহার করে নওজোয়ানদের সাথে সাদৃশ্য রাখার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, তার কারণও এটাই ছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে বার্ধক্যের আবির্ভাব ও বহিঃপ্রকাশ যা ঘটেছিল, তা মূলত কয়েকটি চুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; আর এও হয়েছিল আল্লাহ পাকের ভয়ে।

এ সম্পর্কে তিনি স্বয়ং এরশাদ করেছেন, হুদ, ওয়াকিআহ, আল-মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলুন ও ইযাশ-শামসু সূরাসমূহ আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে। আর তাঁর বার্ধক্য আবার এমনও ছিল না যে, যৌবনের আকৃতিতে ত্রুটির সৃষ্টি করে; বরং যৌবনের লাবণ্যের সাথে সাথে বার্ধক্যের মর্যাদা ও নূরও বিদ্যমান ছিল, যেমন হযরত ইবরাহিম খলীল আলাইহিস সালাম ও তদীয় পুত্র হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের মধ্যে বয়সের পার্থক্য বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা পিতার চুলে শুভ্রতা এনেছিলেন। এ দেখে তিনি আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক, এটা কী? আল্লাহ তাআলা বললেন, এটা হচ্ছে, মর্যাদার প্রতীক। তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রভু, আমার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে দিন।

দাড়ি মোবারক

হযরত ইবনে আবি হালা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মোবারকের চুল খুব অধিক ছিল। কাযী আয়ায রহ. তার *শিফা* নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মোবারক এত ঘন ছিল যে, তাঁর পবিত্র বক্ষ আচ্ছাদিত হয়ে যেত। দাড়ির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট পরিমাপ কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না। অবশ্য *ওয়াযায়েবুন নবী* নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দাড়ি স্বাভাবিকভাবে চার আঙুল ছিল, তার কম নয়। তবে এ বর্ণনার সপক্ষে

কোনো সনদ পাওয়া যায় না। তবে এটা ঠিক যে, দীর্ঘ দাড়ি সৌন্দর্যের প্রতীক; বিশেষ করে দাড়ি যখন ঘন হয়।

ওয়াযায়েবুন নবীর উদ্ধৃতি *শিফা* কিতাবের উদ্ধৃতির খেলাফ মনে হয়। আবার এটা *তিরমিযী শরীফের* বর্ণনারও পরিপন্থী। *তিরমিযী শরীফে* এসেছে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি মোবারকের চুল মুঠি দিয়ে ধরতেন এবং গোঁফ কর্তন করতেন আর বলতেন, যে ব্যক্তি গোঁফ কর্তন করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

বুখারী ও *মুসলিম শরীফে* এ মর্মে উক্ত হয়েছে যে, তোমরা মুশরিকদের আকৃতির সাথে বৈপরীত্য আনয়ন করো। অন্য এক বর্ণনায় আছে, মাজুসি—অর্থাৎ অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধাচরণ করো এবং খুব বেশি বিরুদ্ধাচরণ করো। দাড়ি লম্বা করো আর গোঁফ খাটো করো এবং এই কর্তন আচ্ছারকম করো। গোঁফ কর্তন করার ব্যাপারে ইমামগণের মাযহাব ভিন্ন ভিন্ন। তবে কর্তনের ব্যাপারে কমপক্ষে এতটুকু করতে হবে, যেন ঠোঁটের কিনারা দেখা যায়। কারও মতে গোঁফ সম্পূর্ণ কামিয়ে ফেলা বেদআত; আবার কারও মতে সুন্নাত। হাদীস শরীফে এসেছে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় গোঁফ মোবারক মেসওয়াক দিয়ে উঠিয়ে ধরতেন—এটা সম্ভবত বিশেষ সময়ের জন্য। হানাফী আলেমগণের মত হচ্ছে, চোখের ভুরু-পরিমাণ রেখে দেওয়া। তবে মুজাহিদগণের বেলায় এর বিধান স্বতন্ত্র। তাদের জন্য মোস্তাহাব হচ্ছে, গোঁফ দু'পাশে লম্বা করে রাখা, যা দেখে দুশমনদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। তবে গোঁফ লম্বা করতে যেয়ে এতটুকু করা যাবে না, যাতে ঠোঁটের প্রান্ত আচ্ছাদিত হয়ে যায়। এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে *মাতালেবুল মুমিনীন* কিতাবে। গোঁফের দু'পাশের চুলকে লম্বা করে রাখতেন। এরূপ লম্বা করার কারণে গোঁফ দিয়ে মুখ ঢেকে যেত না এবং আহারের সময় আহার্য বস্তুও তা স্পর্শ করত না।

দাড়ি লম্বা রাখার পরিসীমা সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী মাযহাব অনুসারে চার আঙুল লম্বা রাখতে হবে। তবে তার অর্থ হচ্ছে, এর চেয়ে কম যেন না হয়, এর চেয়ে বড় হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু অন্য এক বর্ণনা অনুসারে চার আঙুলের অধিক হলে তা কর্তন করা ওয়াজিব।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, ওলামা ও মাশায়েখগণ এর চেয়ে বেশি লম্বা রাখা বা কর্তন করা সম্পর্কে নিম্নোক্ত দু'খানি হাদীস দলিলস্বরূপ উল্লেখ করেন, যা *বুখারী শরীফের* কিতাবুল লিবাসের শেষের দিকে উল্লিখিত হয়েছে—যেমন, হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার দাড়িকে মুষ্টি দিয়ে ধরতেন এবং মুষ্টির বাইরের অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলতেন।

হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন হজ বা ওমরা করতেন, তখন তার দাড়িকে মুষ্টিবদ্ধ করতেন এবং তার অতিরিক্ত যা থাকত, তা কর্তন করে ফেলতেন। আবার হযরত নাফে রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, মোচ অতিমাত্রায় কর্তন করা এবং দাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তা হলে প্রশ্ন জাগে, হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু মুষ্টির অতিরিক্তটুকু কর্তন করতেন কেন? অথচ তিনিই উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী! হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ তার জবাব দেন এভাবে—হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যে দাড়ি কর্তন করতেন, তা হজ ও ওমরার সময়ের জন্য খাস ছিল। অন্য সময় দাড়ি লম্বা রাখতেন। এ ব্যাপারে অনারবদের ন্যায় (দাড়ি কর্তন করা) আমল করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সালফে সালেহীনদের বিভিন্ন আমল ছিল।

গর্দান শরীফ

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গর্দান শরীফের বর্ণনায় ইবনে আবি হালা রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গর্দান মোবারক রৌপ্যের মতো স্বচ্ছ-উজ্জ্বল ও পুতুলের মতো ছিল।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুতুলের মতো শিল্পিত গঠনের সাথে উপমা দেওয়াটা বাহ্যত আদবের খেলাফ বলে মনে হয়, কিন্তু পুতুলের মধ্যে যে নিপুণতা ও শৈল্পিক দিক ফুটে ওঠে, সেদিকে লক্ষ করে এ তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে। *নেহায়া* কিতাবে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। *শামায়েলে তিরমিযীর* টীকায় বর্ণনা এসেছে دمية الغزال;—دمية

হরিণকে বলা হয়। অন্য বর্ণনা অনুসারে دمية হরিণের বাচ্চাকে বলা হয়। তবে অভিধানের গ্রন্থসমূহে এরকম উল্লেখ নেই। আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

হাদীস শরীফে ব্যবহৃত في صفاء الفضة বাক্যটি দ্বারা গর্দান মোবারকের গুণাবলি প্রকাশ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। *মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার* অন্য এক বর্ণনায় উক্ত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গর্দান মোবারক এমন শুভ্র ছিল, যেন তা রুপা দিয়ে তৈরি। এ সমস্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

মোবারক স্কন্ধদ্বয়

বাজু ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে কাঁধ বলা হয়। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধ মোবারকের বর্ণনায় এসেছে—بعيد ما بين المنكبين—অর্থাৎ, তাঁর স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব ছিল। আবার এ بعيد শব্দটিকে بعييد—তথা تصغير (ক্ষুদ্র অর্থবোধক বিশেষ্য) হিসাবেও পড়া হয়—অর্থাৎ, অল্প দূরত্ব ছিল। কেউ কেউ আবার উক্ত বর্ণনার ব্যাখ্যা করেছেন, প্রশস্ত বক্ষের অধিকারী। বস্তুত বক্ষের প্রশস্ততা, সে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যার বর্ণনা এরকম এসেছে—বক্ষ প্রশস্ত ও দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব। এ দু'টি বৈশিষ্ট্যই একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু এ দু'টি বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন দু'খানি অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু তার বর্ণনা আলাদাভাবে পেশ করা হয়েছে।

পবিত্র বক্ষ

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ মোবারক প্রশস্ত এবং দর্শনীয় ছিল। এই যে বর্ণনা, এটা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক দৈহিক কাঠামোর বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত; তাই এরূপ বর্ণনা

এসেছে। অন্যথায় তাঁর অভ্যন্তরীণ যে হৃদয়, তার বর্ণনা তো পবিত্র কালামে এরকম প্রদান করা হয়েছে—

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.

হে আমার বন্ধু, আমি কি আপনার বক্ষ সম্প্রসারিত করিনি?

পূতপবিত্র কলব

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কলবের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। যেহেতু কলব হচ্ছে একটি বাতেনি অঙ্গ। আর এখানে তাঁর জাহেরি সুরত নিয়ে আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। তাই গবেষণা ও চিন্তার মাধ্যমে তা বুঝতে হবে। কেননা, কোনো বর্ণনায় কলব সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা এসেছে—

عظيم مشاش المنكبين والكتد.

الكتد শব্দটির কাফ বর্ণে যবর ও তা বর্ণে যের দিয়ে পড়লে অথবা তা বর্ণে যবর দিয়ে পড়লে তার অর্থ হয়—ওই স্থান, যেখানে স্কন্ধদ্বয় এসে মিলিত হয়েছে। আর مشاش শব্দটির মিম বর্ণে পেশ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে ঘাড়ের হাড়, যা মাথার সঙ্গে মিলিত। তখন বর্ণনার অর্থ দাঁড়ায়, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশাল স্কন্ধের অধিকারী ছিলেন।

পূতপবিত্র উদর

এ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেট ও বক্ষ উভয়ই সমান ছিল—অর্থাৎ, বক্ষ পেটের চেয়ে উঁচু ছিল না, আবার পেটও বক্ষ থেকে স্ফীত ছিল না—উভয় অঙ্গই সমান সমান, স্বাভাবিক ছিল। হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসে যে বর্ণনা এসেছে, তার ব্যাখ্যা হচ্ছে, প্রশস্ত উদর। আর এ বৈশিষ্ট্যটি চওড়া বক্ষর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার উদর ও বক্ষ সমান হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। হুযুর আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেট মোবারকের বর্ণনায় হযরত উম্মে হানী রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেট মোবারক দর্শন করেছি। তাঁর পেট মোবারক ছিল সুবিন্যস্ত কাগজের মতো—অর্থাৎ, খুব মসৃণ ও সুন্দর।

পবিত্র বক্ষকেশ

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকের পশম মোবারকের বর্ণনায় হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাঁর বুকের পশম ছিল 'যু মাসরুবা'। হযরত ইবনে আবি হালা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা মতে 'দাকীক মাসরুবা' ওই পশমরাজিকে বলা হয়, যা সিনার ওপর থেকে নাভি পর্যন্ত লম্বিত থাকে। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত পশমরাজি সরু ছিল বিধায় তাকে خيط বা ডোরা শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *সাররাহ* কিতাবে مسرُبة এর 'রা' বর্ণে পেশ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ বক্ষ ও নাভির মধ্যবর্তী স্থানের পশম। 'মাসরুবা' শব্দটি বাহ্যত سرب থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে রাস্তা। বক্ষের নিম্নাংশ, যেখান থেকে পেট আরম্ভ, সে স্থান ছিল লোমমুক্ত। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণনা এসেছে, তাঁর বক্ষের দু'প্রান্ত এবং পেট মোবারকে 'সারনুবাহ' নামক পশম ব্যতীত আর কোনো পশম ছিল না। শরীরের অন্যান্য অঙ্গে পশম ছিল, যার বর্ণনা হাদীস শরীফে এরূপ এসেছে—হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহুদ্বয়, বাজুদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, সিনা মোবারকের পশমসংক্রান্ত বর্ণনায় যে 'পশমহীন হওয়া'র বর্ণনা পাওয়া যায়, তা বস্তুত ব্যাপক পশমাবৃত দেহ না হওয়া বোঝানোর জন্য এসেছে।

বগল মোবারক

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বগল শরীফ তাঁর সমগ্র দেহ মোবারকের ন্যায় শুভ্র ছিল। আল্লামা তাবারী রহ. বলেন, এ বৈশিষ্ট্যটি কেবল হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্ধারিত। আল্লামা কুরতুবী রহ.-এর বর্ণনায় এর চেয়েও একটু আলাদা অবস্থা পাওয়া

যায়। তিনি বলেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বগল মোবারক পশমহীন ছিল। তবে এ সম্পর্কে কেউ কেউ আবার ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। কেননা, ত্বকের শুভ্রতায় এটা প্রমাণিত হয় না যে, সেখানে পশম থাকবে না। আবার কোনো কোনো হাদীসে এরূপ বর্ণনা এসেছে, তিনি বগল মোবারকের পশম তুলে ফেলতেন। আল্লাহ পাকই অধিক জ্ঞাত।

কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, عفر إبطيه;—عفر বলা হয় শুভ্র বর্ণকে; হারভীও এ রকম বলেছেন। *সাররাহ* নামক কিতাবে عفر-এর অর্থ করা হয়েছে, লাল ও সাদা বর্ণের মিশ্রণ, যাতে রক্তিমাভার প্রাধান্য থাকে।

জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, একদা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বগলের পাশে ধরে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। তখন আমি অনুভব করলাম যে, তাঁর বগল মোবারক থেকে মেশকের সুঘ্রাণ বের হচ্ছে।

পিঠ মোবারক

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃষ্ঠদেশ বিগলিত রৌপ্যের ন্যায় ছিল—অর্থাৎ পাক, সাফ, শুভ্র ও সমান ছিল।

মোহরে নবুওয়াত

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবুওয়াত ছিল, তিনি নবুওয়াতের ধারা সমাপ্তকারী ছিলেন। মোহরে নবুওয়াত ছিল ঈষৎ উঁচু মাংসবিশেষ, যা শরীরের বর্ণের মতোই স্বচ্ছ ও নূরানি। উক্ত মাংসপিণ্ডকেই মোহরে নবুওয়াত বা খাতামুন নবুওয়াত বলা হয়। خاتم শব্দটির 'তা' বর্ণে যখন যবর দিয়ে পড়া হয়, তখন এর অর্থ হবে মোহর বা আংটি। সার্বিকভাবে 'খাতামুন্নাবিয়্যিন'-এর অর্থ দাঁড়ায়, তাঁর পর আর কোনো নবীর আবির্ভাব হবে না। সর্বশেষ নবী যে তিনি, তার প্রমাণ হচ্ছে মোহরে নবুওয়াত। খাতামুন্নাবিয়্যিন হিসাবে

তাঁকে আখ্যায়িত করার কারণ এই যে, পূর্ববর্তী বিভিন্ন আসমানি কিতাবে তাঁর পরিচিতি এভাবেই প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং মোহরে নবুওয়াতখানি একটি নিদর্শন, যা দেখে মানুষ বুঝে নিতে পারে, তিনিই ওই আখেরি যামানার নবী, যাঁর সম্পর্কে পূর্বে শুভ সংবাদ প্রদান করা হয়েছিল। মোহরে নবুওয়াত আল্লাহ তাআলার মহান নিদর্শনাবলির অন্যতম নিদর্শন, যা দ্বারা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষিত করা হয়েছে। আল্লামা হাকেম রহ. স্বীয় *মুস্তাদরাক* কিতাবে হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, জগতে যত নবী-রাসূল আবির্ভূত হয়েছেন, সকলেরই ডান হাতে আলামতে নবুওয়াত বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলামতে নবুওয়াত তাঁর স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল।

বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, মোহরে নবুওয়াত নূরানি ছিল, যা ঝকমক করত। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তাঁর ওফাতের পর উক্ত মোহরে নবুওয়াত গায়েব হয়ে গিয়েছিল। এই আলামত থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, তাঁর ওফাত হয়েছে। যেহেতু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর মানুষের মধ্যে এ নিয়ে সন্দেহ এবং মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল যে, আসলেই তাঁর ওফাত হয়েছে কি না! মোহরে নবুওয়াত অদৃশ্য হওয়া ছিল ওফাতের প্রমাণ; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এ মতটি শুদ্ধ বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁর ওফাতের পরেও তো তাঁর নবুওয়াতের বিধান বিদ্যমান ছিল। ওফাতের মাধ্যমে নবীর নবুওয়াত ও রেসালাত সমাপ্ত হয় না। মোহরে নবুওয়াত গায়েব হওয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলার কী হেকমত নিহিত রয়েছে, তা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। অধিকাংশ বর্ণনায় এসেছে, দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবুওয়াত ছিল বাম কাঁধের নরম মাংসপিণ্ডের কাছে।

আল্লামা তাওরিশী রহ. বলেন, দু'রকম বর্ণনার মধ্যে মূলত কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা, দু'কাঁধের মধ্যে কথাটির অর্থ এই নয় যে, ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে। বাম কাঁধের দিক হলেও তা দু'কাঁধের মধ্যেই ধরতে হবে। যে বর্ণনায় ডান কাঁধের পাশে আছে বলে উল্লেখ আছে, সেখানেও এরূপ সমাধানই প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ পাকই উত্তম জানেন।

বর্ণনাকারীগণ মোহরে নবুওয়াতের আকার-আকৃতির বর্ণনাও করেছেন। অপরকে বোঝানোর জন্য এর উপমা-উদাহরণও পেশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, তা কবুতরের ডিমের ন্যায় সাদা ছিল; আবার কেউ বলেছেন, রক্তিম মাংসপিণ্ডের ন্যায় ছিল। *সাররাহ* কিতাবে غدة শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে; সেখানে বলা হয়েছে غدة শব্দের বহুবচন হচ্ছে غُدَدْ, যার অর্থ হচ্ছে গোশতের শক্ত গ্রন্থি। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরে নবুওয়াত غدة-এর ন্যায় ছিল—এর অর্থ হচ্ছে, তাতে লাল বর্ণের প্রাধান্য ছিল। সুতরাং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরে নবুওয়াত তাঁর দেহের বর্ণের মতো ছিল বলে যে বর্ণনা করা হয়েছে, এই বক্তব্যটি তার পরিপন্থী নয়। কারণ, এরূপ বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা বলে মোহরে নবুওয়াতের রঙ কালো বা নীল ছিল, তাদের বক্তব্যকে খণ্ডন করা—যেমন ইবনে হাজার মক্কী স্বীয় কিতাব *শরহে শামায়েলে* উল্লেখ করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে মোহরে নবুওয়াত ছিল زر الحجلة (ঝালরের গুটি)-এর ন্যায়।

زر শব্দের অর্থ হচ্ছে গুটি আর الحجلة-এর অর্থ ওই স্থান, যেখানে ঝালর দিয়ে সাজিয়ে নববধূকে বসানো হয়। الحجلة শব্দের বহুবচন হচ্ছে حِجَلْ। অধিকাংশ ব্যাখ্যাতাই এরকম বলেছেন। আবার কেউ কেউ الحجلة-এর অর্থ করেছেন এক প্রকারের পাখি। আর زر-এর অর্থ পাখির ডিম—অর্থাৎ, তাদের মতে মোহরে নবুওয়াত ছিল الحجلة নামক পাখির ডিমের ন্যায়। যে হাদীসে বলা হয়েছে, মোহরে নবুওয়াত ছিল কবুতরের ডিমের ন্যায়—এই মতটি উক্ত হাদীসের বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে; কিন্তু زر শব্দের অর্থ অভিধানে ডিম লেখা হয়নি। *তিরমিযী শরীফের* এক বর্ণনায় এসেছে, মোহরে নবুওয়াত ছিল একখানা মাংসপিণ্ড। আবার অন্য এক বর্ণনায় এসেছে একটি মুষ্ঠির ন্যায়, যার মধ্যে ثعاليل-এর ন্যায় তিলক বিদ্যমান ছিল। ثعاليل বলা হয় ওই সমস্ত দানা, যা চামড়ার নিচে সৃষ্টি হয়। এ সমস্ত যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, সবকিছুই মোহরে নবুওয়াতের বাহ্যিক আকৃতি

ও ধরন সম্পর্কিত। তবে এর অন্তরালে রয়েছে আল্লাহ তাআলার মহান কুদরতের এক অবর্ণনীয় রহস্য, যা কেবল হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই নির্ধারিত ছিল। অন্য কোনো নবীর বেলা এরকম ছিল না। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ।

পবিত্র বাহুদ্বয়

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মোবারকের বর্ণনায় *শামায়েলে তিরমিযীতে* এসেছে, পাঞ্জাদ্বয় লম্বা ছিল। তাঁর বাহু ও কবজি মোবারক মোটা ছিল। হাতের তালু মাংসল ছিল। এক বিবরণে এসেছে, হাতের তালু প্রশস্ত ছিল। এ সকল বর্ণনার সারকথা হচ্ছে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মোবারক ভরপুর ও পূর্ণাঙ্গ ছিল—সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ছিল। হাতের তালু নরম ছিল—যেমন সুন্দর ও সামঞ্জস্যশীল দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়—মসৃণ ও সুন্দর শরীর।

তাবরানী মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত মোবারক সম্পর্কে তাঁর পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছেন, আমি একদা রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হই এবং তাঁর সাথে মুসাফাহা করি। আমার মনে হলো হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মোবারক যেন রেশমের চেয়ে নরম এবং বরফের ন্যায় শান্তিপ্রদ শীতল।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, আমি রেশমকেও রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মোবারকের চেয়ে নরম পাইনি। তাঁর সমস্ত দেহ মোবারক নরম, কোমল, মসৃণ, মাংসল ও সুদৃঢ় ছিল; ঠিক তেমনিই হাতের তালু মোবারকও নরম ও মাংসল ছিল।

অবশ্য কোনো কোনো ব্যাখ্যাদাতা এরকম বলে থাকেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মোবারকের নরম বা শক্ত হওয়ার বর্ণনার সময় ও অবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং তিনি স্বীয় গৃহে বা

যুদ্ধক্ষেত্রে যখন হাতে অস্ত্র তুলে নিতেন বা কোনো কাজকর্মে নিয়োজিত হতেন, তখন হাত শক্ত হয়ে যেত। আবার যখন তা ছেড়ে দিতেন, তখন পূর্বের ন্যায় হাতে মৌলিক কোমলতা ও স্বাভাবিক নম্রতা ফিরে আসত।

শিফা গ্রন্থের প্রণেতা কাজী আয়ায রহ. বলেন, উক্ত ব্যাখ্যাটি পুরুষদের জন্য প্রশংসনীয় বটে, তবে নারীদের জন্য নয়। হাতের কঠোরতা বা রুক্ষতা পুরুষ-শ্রেণির বেলায় প্রযোজ্য, কিন্তু নারীদের বেলায় এরূপ নয়। আর সে রুক্ষতা শব্দ নিয়ে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের বর্ণনা দেওয়া সমীচীন হতে পারে না; তাই একে তিনি খণ্ডন করেছেন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের আঙুলসমূহ দীর্ঘ ও প্রলম্বিত ছিল। *শিফা* গ্রন্থে এসেছে, আঙুলসমূহ লম্বা ছিল।

তাঁর হস্ত মোবারকের গুণাবলি, নিদর্শন, বরকত ও মোজেযাসমূহের বর্ণনার হক আদায় করা লেখকের ক্ষমতাবহির্ভূত। *মুসলিম শরীফের* এক বর্ণনায় এসেছে, একদা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর গণ্ডদেশে তাঁর পবিত্র হস্ত সঞ্চালন করলেন। তিনি তাঁর পবিত্র হস্ত মোবারক থেকে এমন শীতলতা ও সুবাস অনুভব করলেন, যেন হুযুর এইমাত্র আতর বিক্রেতার কৌটা থেকে তাঁর হস্ত মোবারক বের করে এনেছেন। *বায়হাকী* ও *তাবরানী শরীফে* হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, আমি যখনই হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুসাফাহা করতাম, তখন তাঁর হস্ত মোবারক স্পর্শ করার কারণে আমার হাত এত সুরভিত হয়ে যেত যে, সমস্ত দিন ভর আমার হাত থেকে ঘ্রাণ বের হতো।

হযরত ইয়াযিদ ইবনে আসওয়াদ বর্ণনা করেন, একদা হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হস্ত মোবারক আমার হাতের মধ্যে রাখলেন। তখন আমি তাঁর হাতকে বরফের চেয়ে অধিক শীতল ও মেশকের চেয়ে অধিক সুবাসিত পেলাম। হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা আমার অসুস্থতায় হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি স্বীয়

হাতখানা আমার কপালের ওপর রাখলেন। এরপর আমার চেহারা, বক্ষ ও পেটের ওপর স্বীয় পবিত্র হস্তখানা বুলিয়ে দিলেন। এতে আমার অনুভব হলো, এখন পর্যন্ত তাঁর হাতের শীতলতা আমার কলিজা পর্যন্ত বিরাজ করছে। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহে যে সুগন্ধি ছিল, তা কখনো ভুলে যাওয়া যায় না।

এখন আসা যাক হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মোবারকের শীতলতা অনুভব করার মর্মার্থ কী—এ প্রসঙ্গে বলা সমীচীন যে, তাঁর শরীর মোবারক তো স্বাস্থ্যসম্মত উষ্ণ ও ভারসাম্যময় অবশ্যই ছিল; তা হলে উক্ত শীতলতার মানে কী?—উক্ত শীতলতা থেকে ওই শীতলতা উদ্দেশ্য নয়, যা অস্বাস্থ্যকর শীতলতার কারণে হয়ে থাকে, যাতে দেহ শীতল হয়ে যায়; বরং উক্ত শীতলতার অর্থ হচ্ছে তীব্র উত্তাপ দেহের মধ্যে বিরাজ না করা এবং মানুষের হৃদয়ে স্পর্শসুখ দেওয়ার মতো এক বিশেষ শীতল অনুভব। কেননা, তাঁর হস্ত মোবারক স্পর্শ করলে একপ্রকার আস্বাদ ও প্রশান্তি অর্জিত হতো, যেমন হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ও অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়।

পবিত্র পদযুগল

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মোবারকের বর্ণনায় এসেছে, উভয় কদম মোবারক বড় ও মাংসল ছিল।

এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁর উভয় কদম মোবারক সমান্তরাল ছিল। এতে বাহুল্য বা ভঙ্গুরতা কিছুই ছিল না। পা দু'খানা মসৃণ ও পবিত্র হওয়ার কারণে তাতে পানি ঢেলে দিলে তড়িৎগতিতে তা প্রবাহিত হয়ে পড়ে যেত।

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি যখন জমিনে পা রেখে চলতেন, তখন সমস্ত পা ফেলেই চলতেন; পায়ের কোনো স্থান স্ফীত ছিল না। *বায়হাকী শরীফে* হযরত আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মোবারক স্ফীত ছিল না, তিনি যখন

হাঁটতেন, তখন পুরো পা ফেলে হাঁটতেন। এটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আসাকির রহ.।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ের সৌন্দর্যের দিক দিয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর পায়ের গোড়ালি সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, তাঁর গোড়ালিতে গোশত কম ছিল।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া কিতাবে মায়মুনা বিনতে ফারযাম রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। আমি তাঁর কদম মোবারকের তর্জনী আঙুলের দীর্ঘতা কখনো ভুলতে পারি না। তাঁর পায়ের তর্জনী আঙুল পায়ের সমস্ত আঙুলের দীর্ঘতা কখনো ভুলতে পারি না। তাঁর পায়ের তর্জনী আঙুল পায়ের সমস্ত আঙুলের চেয়ে লম্বা ছিল—আহমদ ও তিরমিযী এরকম বর্ণনা করেছেন। হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের তর্জনী আঙুল অন্যান্য আঙুলের তুলনায় দৃশ্যমান ছিল।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. বলেন, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা শাহাদাত ও মধ্যমা মিলিত করে বললেন, আমার আবির্ভাব ও কেয়ামত এই দুই আঙুলের ন্যায়—অর্থাৎ, খুব কাছাকাছি সময়। তিনি কেয়ামতের পূর্বে তাঁর আবির্ভাবের সময়টাকে এভাবে বোঝালেন, যেমন উক্ত দু'আঙুলের মধ্যকার ব্যবধানবিহীন সংযোগ।

পায়ের গোছা মোবারক

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ের গোছা মোবারক সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তার পায়ের গোছা দু'খানি সরু ও মসৃণ ছিল, খুব মাংসল ছিল না। তাঁর পায়ের গোছাদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সমান, পরিষ্কার, মসৃণ ও শুভ্র দু'খানা মোবারক পায়ের গোছা দৃশ্যমান হতো, যা যে কোনো দর্শককে মুগ্ধ করত।

পবিত্র অঙ্গসৌষ্ঠব

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল পবিত্র বাগান ও আকর্ষণীয় বাগিচার বৃক্ষের শাখাসদৃশ—অর্থাৎ, তা মসৃণ, সঠিক সুপরিমিত ও আঁটসাট ছিল। তা খর্বাকৃতির ছিল না, আবার অধিক লম্বাও ছিল না; তবে দীর্ঘতার দিকেই টানটান ছিল। সুতরাং হাদীসে এসেছে, জনসমষ্টির মধ্যে তিনি ছিলেন মধ্যমাকৃতির দেহবিশিষ্ট। অন্য এক হাদীসে এসেছে, বেঁটে দেহের চেয়ে লম্বা, আবার লম্বা দেহের চেয়ে খাটো—এর অর্থ হচ্ছে, বেঁটে হওয়ার চাইতে কিছুটা লম্বা—অর্থাৎ, দীর্ঘতার দিকে ঈষৎ টানটান ছিল তাঁর দেহ মোবারক;—এককথায় মধ্যমাকৃতি ও ভারসাম্যময় দীর্ঘ।

আবার কোনো কোনো হাদীসে এসেছে, তাঁর দেহ মোবারক অন্যান্যদের থেকে আলাদা ধরনের লম্বা ছিল না। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আছে, তিনি খুব বেশি লম্বা দেহের অধিকারী ছিলেন না। তবে লম্বার দিকে টানটান হওয়ার কারণে বেঁটে অবস্থার চাইতে উঁচু ছিলেন। তিনি যখন কোনো সম্প্রদায়ের লোকের কাছে যেতেন, তখন তাদের মস্তক তাঁর মস্তকের নিচে পড়ে থাকত।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোথাও একা একা থাকতেন, তখন তাঁকে মধ্যমাকৃতির দেখা যেত। আর যখন অন্যান্য লোকদের সঙ্গে থাকতেন, তখন লম্বাকৃতির মনে হতো। উক্ত অবস্থায় তাঁকে লম্বা দেখা যেত বলেই তিনি লম্বা ছিলেন—এ কথা বলা হয়েছে। দুই ব্যক্তির মধ্যে যখন তিনি দাঁড়াতেন, তখন উভয়ের তুলনায় তাঁকেই লম্বা দেখা যেত। আবার যখন সে দু'টি লোক থেকে ভিন্ন হতেন, তখন তাঁকে দেখা যেত মধ্যমাকৃতির। তিনি যখন কোনো মজলিসে দণ্ডায়মান হতেন, তখন তাঁর স্কন্ধদ্বয় উঁচু থেকে উঁচুতর দেখা যেত।

পবিত্র শরীরের রঙ

হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকের বর্ণ ছিল উজ্জ্বল ও দ্যুতিময়। সাহাবা-সমাজের ঐক্যবদ্ধ মত এই যে, তাঁর দেহের

বর্ণে শুভ্রতার আধিক্য ছিল। সাহাবাগণ শুভ্রতা দ্বারাই তাঁর প্রশংসা ও বর্ণনা পেশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, লাবণ্যময় শুভ্র ছিল। এ জাতীয় বর্ণনা দ্বারা বোঝানো হয়েছে, তাঁর দেহ মোবারক শুভ্র এবং লাবণ্যময় ছিল। বস্তুত তাঁর রূপসৌন্দর্য প্রকাশার্থে, দিদারের উদগ্র বাসনায়, উন্মুখজনের চিত্তাকর্ষণের জন্য চরম ও পরম আস্বাদ প্রদানের বর্ণনা প্রকাশার্থে লাবণ্য তাঁর দেহ মোবারকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি এমন শুভ্রতা, যার মধ্যে লাল, হলুদ বা বাদামি রঙ কোনোটিরই সংমিশ্রণ নেই—এ জাতীয় শুভ্রতার সাদৃশ্য দেখা যায় শ্বেতী বা ধবল রোগীর চেহারার মধ্যে।

অন্য এক বিবরণে আছে, তাঁর চেহারা মোবারক খুব শুভ্র ছিল। আর শ্মশ্রু মোবারক ছিল গাঢ় কৃষ্ণ। আবু তালেব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় বলেছেন, তাঁর চেহারা মোবারকের শুভ্রতার কাছে বর্ষণকারী শুভ্র মেঘমালাও শুভ্রতা ভিক্ষা করে। তিনি এতিম ও বিধবাদের প্রতিপালনকারী। হযরত আলী মুর্তজা রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর বর্ণ সাদা মাশরাবি সদৃশ;—মাশরাব ওই শরাবকে বলা হয়, যার এক বর্ণের সাথে অন্য বর্ণের মিশ্রণ ঘটে—যেমন নাকি এক রঙের শরাব পান করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য বর্ণের শরাবও পান করানো হয়েছে। এখানে মাশরাব–এর অর্থ করা হয়েছে লাল বর্ণ। অন্য বর্ণনায় মাশরাবের ব্যাখ্যাও এসেছে, যেমন তাঁর বর্ণ সাদা মাশরাবের মতো, যাতে লাল রঙও মিশ্রিত। বস্তুত বর্ণনাসমূহ দ্বারা তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠবের চাকচিক্য ও দ্যুতিময়তাকে বোঝানো হয়েছে।

নাসাঈ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামগণের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। এক বেদুইন দূত হয়ে এল। সে সরলতা, মহব্বত ও বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল, আবদুল মুত্তালিবের বেটা কোথায়? আর তোমাদের মধ্যে তিনি কোন ব্যক্তি—অর্থাৎ, ওই সুমহান ব্যক্তিত্ব, যার রূপ ও সৌন্দর্যের সুখ্যাতি পৃথিবীকে বেষ্টন করে নিয়েছে, যার শান-শওকতের জয়গান সারা পৃথিবীতে গীত হচ্ছে, তিনি কোথায়? সাহাবাগণ বলতে লাগলেন, সাদা ও লাল বর্ণের (দুধে আলতায়) ওই লোকটি, যিনি স্বীয় কনুইয়ে ভর করে বসে আছেন।

পবিত্র পদবিক্ষেপ

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পদবিক্ষেপ সম্পর্কে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীস এরকম—

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁটতেন, তখন ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটতেন, যেন তিনি ওপর থেকে নিচের দিকে নামছেন। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটার উদাহরণ, ফুলবিশিষ্ট বোঁটা ফুলের ভারে যেমন ঝুঁকে পড়ে। কদম মোবারক যথেষ্ট নিপুণতা, দৃঢ়তা ও দ্রুততার সাথে উঠাতেন। বাযযার হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটার সময় মাটিতে পুরো কদম ফেলে হাঁটতেন।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, তাঁর চলার গতি ছিল শক্তিতে ভরপুর, যাতে কোনোরূপ শৈথিল্য, আলস্য, বা স্থবিরতা ছিল না। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি যখন হাঁটতেন, তখন জমিন থেকে পা মোবারক পুরোপুরি উঠাতেন এবং পা বেশ ফাঁক রাখতেন; এরপর সহজভাবে কিন্তু দ্রুততার সাথে কোনোরূপ নড়াচড়া বা কম্পন ব্যতীত পা ফেলতেন। তিনি বলেছেন, যেন উঁচু স্থান থেকে নিম্ন ভূমির দিকে অবতরণ করছেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাস্তায় রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে অধিকতর দ্রুত চলতে কাউকে আর দেখিনি। মনে হতো তাঁর কদম মোবারকের নিচে যেন জমিন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা তাঁর সঙ্গে চলতে গেলে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম এবং শ্রান্তি অনুভব করতাম। তাঁর সঙ্গে হাঁটতে গেলে আমাদেরকে রীতিমতো দৌড় দিতে হতো এবং আমাদের নিঃশ্বাস ফুলে উঠত; কিন্তু তাঁর কাছে কোনো কষ্ট অনুভূত হতো না। তিনি স্বাভাবিক অভ্যাসমতোই হেঁটে চলে যেতেন। কোনোরূপ দোদুল্যমানতা বা কম্পন পরিলক্ষিত হতো না। এ ধরনের চলন প্রত্যয়, সাহস এবং বীরত্বের নিদর্শন। এ ধরনের হাঁটার মধ্যে গতি, দৃঢ়তা এবং ভারসাম্য বিদ্যমান থাকে, যার ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রশান্তি ও আরাম পাওয়া যায়। তিনি কখনো খালি পায়ে

হাঁটতেন, কখনো পদব্রজে চলতেন, আবার কখনো বাহনে করে চলতেন—বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে।

তিনি যখন সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতেন তখন সাহাবীগণকে আগে রাখতেন এবং তিনি পেছনে পেছনে হাঁটতেন। ওই সময় তিনি এরশাদ করতেন, আমার পিঠের দিক ফেরেশতাগণের জন্য মুক্ত রাখো। হাদীস শরীফে এরকম বর্ণনা এসেছে, হাঁটার সময় তিনি সাহাবীগণকে আগে রাখতেন। কোথাও সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সাহাবীগণকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর নিজে রওয়ানা হতেন। চলার পথে দুর্বল ও কমজোর লোকদেরকে ধরে ধরে নিয়ে যেতেন। আর যারা যেতে অক্ষম হতো, তাদেরকে তিনি নিজের সঙ্গে সওয়ারিতে আরোহণ করিয়ে নিয়ে যেতেন।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুশবু

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি কোনো আম্বর, মেশক ও সুগন্ধিযুক্ত বস্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুবাস থেকে অধিক সুবাসযুক্ত কখনো দেখিনি। তিনি কারও সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করলে সেই ব্যক্তি সারাদিন মুসাফাহার সুবাস অনুভব করত। তিনি কোনো শিশুর মাথায় স্নেহবশত হাত রাখলে সেই শিশুকে অন্য শিশুদের মধ্যে সুগন্ধির মাধ্যমে চেনা যেত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো পথ দিয়ে গমন করতেন এবং কেউ তাঁর অন্বেষণে যেত, তখন সে সুগন্ধি দ্বারা বুঝতে পারত, তিনি এ পথ দিয়ে গমন করেছেন। এ সুগন্ধি স্বয়ং তাঁর দেহেই ছিল, বাইরে থেকে ব্যবহার করতে হতো না।–*নাশরুত তীব*

পবিত্র স্বেদ ও দেহবর্জ্যসমূহের সুঘ্রাণ

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিস্ময়কর গুণাবলির মধ্যে দেহ মোবারক থেকে নির্গত পবিত্র সুরভি অন্যতম। এহেন গুণটি তাঁর সত্তাগত ছিল। তিনি দেহ মোবারকে কোনোরূপ সুগন্ধি ব্যবহার না করলেও দেহ থেকে যে সুঘ্রাণ বের হতো, পৃথিবীর কোনো সুগন্ধি তার সমতুল্য হতে

পারত না। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, যত প্রকারের সৌরভ আছে, চাই তা মেশক হোক বা আম্বর, আমি তার ঘ্রাণ গ্রহণ করেছি; কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম দেহের সৌরভের সমতুল্য কিছুই পাইনি।

উতবা ইবনে ফারকাজ সুলামী রাযিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী হযরত উম্মে আসেম রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, আমরা চার মহিলা উতবার স্ত্রী ছিলাম। আর আমরা চার সতীন প্রত্যেকেই চেষ্টা করতাম, কে কার চেয়ে বেশি খুশবু ব্যবহার করে উতবার নিকট যেতে পারি। এহেন প্রয়াসে আমরা প্রত্যেকেই খুশবু খুব বেশি ব্যবহার করতাম। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমাদের সকলের খুশবুই উতবার দেহের খুশবুর কাছে ম্লান হয়ে যেত। আর উতবা রাযিয়াল্লাহু আনহুর খুশবু ব্যবহারের অভ্যাস এরকম ছিল যে, তিনি হাতে স্বাভাবিকভাবে একটু তেল মালিশ করে দাড়িতে মেখে নিতেন, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু তবুও দেখা যেত, তাঁর খুশবুই আমাদের সকলের খুশবুর ওপর প্রবল হয়ে গেছে। এদিকে হযরত উতবা রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন বাইরে যেতেন, তখন লোকেরা বলাবলি করত, আমরাও তো সুগন্ধি ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু উতবার সুগন্ধির তুলনায় আমাদের খুশবু কিছুই নয়। হযরত উম্মে আসেম রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি একদিন আমার স্বামী উতবাকে বললাম, আমরা তো সকলেই সুগন্ধি ব্যবহার করে তার সুঘ্রাণ বিকাশে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের খুশবু তো আপনার সুবাসের ধারে কাছেও পৌঁছুতে পারে না—এর কারণ কী? তখন তিনি বললেন, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমার সমস্ত শরীরে একবার অত্যধিক গরমের কারণে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল (এর কারণে মনে হতো সমস্ত শরীরে যেন আগুন লেগে গেছে)। এতে অস্থির হয়ে আমি হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আমার অসুস্থতার অবস্থা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি এর চিকিৎসা করে দিলেন। বললেন, তোমার শরীরের কাপড় সরাও। আমি কাপড় সরিয়ে তাঁর সামনে বসে গেলাম। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হস্ত মোবারক আমার গায়ের ওপর বুলিয়ে দিলেন। পেট এবং পিঠেও হাত বুলিয়ে দিলেন। সে থেকেই আমার শরীরে

এ সৌরভের সৃষ্টি। এই ঘটনা ইমাম তাবরানী *মুজামে সগীর* নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

এক ব্যক্তি তার কন্যাকে বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠানোর সময় সুগন্ধি খোঁজাখুজি করছিলেন। কিন্তু কোনোখান থেকেই জোগাড় করতে পারছিলেন না। অবশেষে লোকটি হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে সমস্যার কথা বর্ণনা করলেন। তখন হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুশবুর ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তখন কোনো খুশবু ছিল না। তিনি লোকটিকে বললেন, একটি শিশি নিয়ে এসো। লোকটি শিশি নিয়ে এলে তিনি নিজের শরীর মোবারক থেকে নির্গত ক'ফোঁটা ঘাম শিশিতে পুরে দিয়ে বললেন, এই ঘাম সুগন্ধিরূপে ব্যবহার করবে। ওই শিশি থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ঘাম নিয়ে যখন কন্যাটির গায়ে মেখে দেওয়া হলো, তখন সমস্ত মদীনা মুনাওয়ারা তার সুরভিতে মোহিত হয়ে গেল।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বাড়িতে তাশরিফ নিয়ে এলেন। দুপুরবেলায় তিনি শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক থেকে ঘাম নির্গত হচ্ছিল। আমার আম্মাজান উম্মে সুলায়ম একখানা শিশিতে ঘাম মোবারক জমা করতে লাগলেন। হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। বললেন, ওহে উম্মে সুলায়ম, তুমি কী করছ? তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার স্বেদ মোবারক জমা করছি; আমি এগুলো খুশবু হিসাবে ব্যবহার করব। কেননা, আপনার পবিত্র স্বেদের খুশবু তো সবচেয়ে উত্তম খুশবু—হাদীসখানা *মুসলিম শরীফে* বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এও বর্ণিত আছে, সাহাবীগণ হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শনের প্রত্যাশী হয়ে এসে তাঁকে না পেলে রাস্তায় নেমে খুশবু শুঁকতে থাকতেন। তাঁর অতিক্রমণের

ফলে রাস্তায় যে সুবাস ছড়িয়ে পড়ত, তার অনুসরণ করতেন। মদীনা মুনাওয়ারার যে অলিগলিতে সে খুশবু অনুভব করতেন, সেদিকেই তারা ছুটে যেতেন।

এখন পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারায় দেয়ালে দেয়ালে তাঁর মনোহর সুরভির আঘ্রাণ অনুভূত হয়, যার সুবাস আশেকে রাসূলদেরকে উতলা করে—যেন সেই খুশবুর মৃদু পরশ প্রেমিক মুসাফিরগণকে এখনো স্বর্গীয় তৃপ্তির আবেশে মুগ্ধ করে যাচ্ছে। মদীনা তাইয়েবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আবু আব্দুল্লাহ আত্তার প্রাণের আকুতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর এক কবিতার মাধ্যমে। কবিতার মর্মার্থ :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুশবুতে মদীনা তাইয়েবার পরিবেশ সুরভিত। তার তুলনায় মেশক ও কাফুরের সুগন্ধি কোন ছার? সেরকম সুগন্ধি তো সেখানকার খেজুরের ভেতরেও বিদ্যমান।'

জাগ্রত অনুভূতিসম্পন্ন আলেম হযরত শোবাইলী রহ. বলেন, মদীনা তাইয়েবার পবিত্র মৃত্তিকায় এক বিশেষ ধরনের সুঘ্রাণ নিহিত আছে, যা মেশক আম্বরের মধ্যেও পাওয়া যায় না। মদীনা তাইয়েবার মাটিতে এরকম খুশবু সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

আবু নুআঈম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি চেহারার ওপর নির্গত স্বেদবিন্দু মোতির দানার ন্যায় চকচক করত। আর তার খুশবু মেশকের চেয়েও বেশি ছিল।

পবিত্র হস্তের সুঘ্রাণ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মোবারকের বর্ণনায় হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আরও উল্লেখ হয়েছে, একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গণ্ডদেশে স্বীয় হস্ত মোবারক সঞ্চালন করলেন। তাতে আমি এত শীতলতা এবং সুগন্ধি অনুভব করলাম, যেন হুযুর তাঁর হাতখানা এইমাত্র আতরের শিশি

থেকে বের করে এনেছেন। এ অবস্থায় যদি কেউ তাঁর সাথে মুসাফাহা করত, তা হলে সমস্ত দিন হাতের মধ্যে সেই সুবাস লেগে থাকত। তিনি কখনো কোনো শিশুর মাথায় যদি স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতেন, তা হলে ওই শিশুটি অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে যেত।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া নামক গ্রন্থে আবুল ফারাহ নাহরওয়ানী থেকে বর্ণিত আছে, উপরোক্ত হাদীসসমূহে যা যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের সাগর থেকে এক বিন্দুমাত্র। পরওয়ারদিগারে আলম তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সীমাহীন বৈশিষ্ট্য দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন, তার তুলনায় উপরোক্ত বর্ণনা নিতান্তই অপ্রতুল। এ সমস্ত বর্ণনা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ যা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, তা তাদের তৈরি পরিভাষার আলোকে সনদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তারা এ দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই আলোচনা করেননি যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয় বা সুদূর পরাহত।

নবীজি কেমন ছিলেন

মানবজাতির ইতিহাসে মহানবীই এমন একজন অনন্য ব্যক্তি, যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি আচার-আচরণ, প্রত্যেকটি কথা, এমনকি প্রত্যেকটি অভিব্যক্তি পর্যন্ত অত্যন্ত বিশ্বস্ত বর্ণনার মাধ্যমে ধরে রাখা হয়েছে। কমপক্ষে চৌদ্দ হাজার সাহাবী এবং তৎপরবর্তী অগণিত তাবেঈ, মুজাদ্দিদ, জীবনীকার ও সীরাতে-রাসূল-বর্ণনাকারীগণের নজিরবিহীন প্রচেষ্টার ফসলরূপে এ সমস্ত বর্ণনা আজ পর্যন্ত জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

বর্ণনাকারীগণ রাসূলে খোদার শিক্ষা, আদর্শ এবং আচার-আচরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেহারা মোবারক এবং বাহ্যিক অবয়বেরও নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গেছেন। এ সমস্ত বর্ণনা হাদীসের কিতাবসমূহে 'আখলাক' ও 'শামায়েল' অধ্যায়ে সযত্নে সংযোজিত হয়েছে।

যে ছবি যায় না আঁকা

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং *মুসনাদে আহমদ* কিতাবের 'আখলাক' ও 'শামায়েল' সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো একত্র করলে দেখা যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অবয়ব ছিল অপূর্ব কান্তিময়। আকৃতি ছিল মধ্যম, বর্ণ দুধে-আলতায়। ললাট ছিল প্রশস্ত, মাথা শ্রেষ্ঠ ও বৃহৎ, গ্রীবা উন্নত, ঈগল-চঞ্চুর মতো নাসিকা, ডাগর মায়াবি চোখ এবং ভুরু-জোড়া একত্রে সন্নিবেশিত। হৃদয়হরা দু'টো চোখের মণি ছিল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের। সুগঠিত ভরাট চোয়াল এবং ওপরে নিচে সামান্য লম্বাকৃতির মুখমণ্ডলে ঘনকৃষ্ণ বর্ণের শ্মশ্রুরাজি অপূর্ব শোভা বিতরণ করত। ওষ্ঠজোড়া ছিল গোলাপ-পাপড়ির মতো। হঠাৎ দেখলে মনে হতো, যেন দু'ঠোঁটে খুব যত্নের সাথে এক পোঁচ গোলাপি রঙ বুলিয়ে রাখা হয়েছে। অনুপম দু'ওষ্ঠের ফাঁকে সুগঠিত দাঁতের পাটি মুক্তোর ন্যায় জ্বলজ্বল করত।

মাথার চুল ছিল সামান্য কোঁকড়ানো ও ঘন কৃষ্ণবর্ণ। শেষ বিদায়ের সময় এই চুলে এবং শ্মশ্রুতে সামান্য পাক ধরেছিল। দু'চোখের ভুরু ছিল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। বক্ষদেশ ছিল প্রশস্ত এবং ছাতির মধ্যস্থল হতে নাভিমূল পর্যন্ত হালকা রেশমের মতো চুলের রেখা প্রলম্বিত ছিল। দু'বাহু ছিল মাংসল, সুগঠিত এবং সাধারণ মানুষের তুলনায় একটু বেশি লম্বা, জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত। মসৃণ ত্বকবিশিষ্ট শরীরের কোথাও মেদের বাহুল্য দৃষ্টিগোচর হতো না। পায়ের গোছা ছিল সুগঠিত এবং পাতা সামান্য বাঁকানো।

কোথাও দাঁড়ালে মনে হতো যেন শিল্পীর হাতে গড়া একটি মনোরম প্রতিকৃতি দাঁড়িয়ে আছে। হেঁটে যাবার সময় সোজাভাবে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে চলতেন, দেখলে মনে হতো, যেন অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমি হতে নিচের দিকে নেমে আসছেন।

অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ন্যায় তাঁর বাহ্যিক অবয়বও এত কান্তিময়, ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় ছিল যে, দর্শকমাত্রই অভিভূত হয়ে পড়ত। সাহাবীগণ নানাভাবে এই অতুল কান্তির বর্ণনা পেশ করেছেন।

অনেক লোক শুধু একবার এই অতুলনীয় চেহারা দর্শন করেই আত্মহারা হয়েছেন।

মদীনার বিশিষ্ট ইহুদি পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম মহানবীর পবিত্র চেহারা দেখেই বলে উঠেছিলেন, আল্লাহর শপথ, এ চেহারা কোনো কপট মিথ্যাবাদীর হতে পারে না।–*বুখারী*

জাবির ইবনে সামুরা নামের জনৈক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাঁর চেহারা কি খোলা তরবারির মতো ঝলমল করত? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, না, পূর্ণ চাঁদের মতো চমকাত। আমি মেঘের লেশচিহ্নহীন এক পূর্ণিমার রাতে একবার পূর্ণ চাঁদের দিকে আর একবার প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, তাঁর পবিত্র চেহারার তুলনায় আকাশের পূর্ণ চন্দ্র যেন অনেকটা দীপ্তিহীন, নিষ্প্রভ।–*শামায়েলে তিরমিযী*

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক সুশ্রী কাউকে দেখিনি। তাঁর কপোলে যেন সূর্য সন্তরণ করতে থাকত। তিনি যখন মুচকি হাসতেন, তখন প্রাচীর গাত্রেও যেন তার চমক প্রতিবিম্বিত হতো।–*মাদারিজুন নবুওয়াত*

হিন্দ ইবনে আবি হালা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, দর্শকদের দৃষ্টিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল মহান মুরব্বির চেহারা এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে অভিহিত হতো। তাঁর মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমল করত।

কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ কথাবার্তা ছিল অত্যন্ত মধুর, কোনো কারণে বিরক্ত হলেও মুখাকৃতিতে বা আওয়াজে তা প্রকাশ পেত না। ক্রোধের উদ্রেক হলেও শুধু চেহারার বর্ণ লাল হয়ে যেত।

লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলার সময় সুস্পষ্ট উচ্চারণে বলে যেতেন। উপদেশ দেওয়ার সময় অপ্রাসঙ্গিক কোনো কথা বলতেন না। প্রতিটি বিষয়

আলাদা আলাদাভাবে অত্যন্ত স্পষ্ট উচ্চারণে বলে যেতেন। কোনো কথার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হলে একাধিকবার তা উচ্চারণ করতেন। এমন সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী ছিল তাঁর বাচনভঙ্গি, শ্রোতামাত্রই তা সহজে অনুধাবন করতে ও সহজে স্মরণ রাখতে পারত। আওয়াজ ছিল গুরুগম্ভীর; কথার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ ছিল যে, একবার কানে গেলে তা মর্মমূলে গিয়ে প্রবেশ করত। কুরআন পাঠ করার সময় আওয়াজ হয়ে উঠত আবেগময়, বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আওয়াজ উঠানামা করত। হযরত উম্মে হানী বর্ণনা করেছেন, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের গভীরে কাবা শরীফে বসে কুরআন পাঠ করতেন, সেই আওয়াজ আমরা ঘরে শুয়েই সুস্পষ্ট শুনতে পেতাম।

সাহাবী হযরত হিন্দ বর্ণনা করেছেন, রাসূলে খোদাকে দেখলে মনে হতো, সবসময় যেন তিনি কী এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে কখনো বের হতে কেউ শোনেনি। কথাবার্তার মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ ছিল যে, কেউ সে কথার মধ্য মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে নিতে পারত না।

মহানবীর বাগ্মিতা ছিল অপূর্ব। নবুওয়াতের কথা সর্বপ্রথম ঘোষণা করার সময় মক্কার আবু কুবাইস পর্বতশীর্ষে দাঁড়িয়ে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যেই এমন এক অপূর্ব আবেদন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে অনেকের অলক্ষ্যেই অন্তরের গভীরে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধাবনত মনোভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী যুগে ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা সেই প্রভাবের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। কুরআন পাকের অনুরূপ সুরলহরির পর বাগ্মিতাই ছিল ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মহানবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। তাঁর বক্তৃতা একবার যে শুনেছে, তার অন্তরেই বিপ্লাবাত্মক পরিবর্তনের সূচনা হয়ে গেছে।

বক্তৃতা করার সময় মাঝে মাঝে ডান হাত ওপরে তুলে আঙুল দ্বারা ইশারা করতেন। কোনো আশ্চর্যজনক বিষয় বোঝানোর সময় কখনো কখনো হাতের তালু ঘুরিয়ে নিতেন। আনন্দ প্রকাশ পেলে দৃষ্টি অবনত করে ফেলতেন। অন্যথায় সাধারণত কথাবার্তা বলার সময় দৃষ্টি ওপরে থাকত।

কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করার সময় মনে হতো যেন ছবি এঁকে তিনি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরছেন। তাঁর মুখে বেহেশত ও দোজখের বর্ণনা শোনার সময় মনে হতো, তিনি যেন তা দেখে দেখে বর্ণনা করছেন।

সবসময় হাসিমুখে থাকতেন, সঙ্গী-সাথিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র হাসিমুখে অভ্যর্থনা করতেন, কিন্তু জীবনে কোনো দিন তাঁকে কেউ অট্টহাসি হাসতে দেখেনি। প্রবল হাসির উদ্রেক হলে কখনো কখনো বিদ্যুচ্চমকের মতো এক ফালি দাঁতের ঔজ্জ্বল্য ফুটে বের হতো। সাহাবী জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, জীবনে যতবার আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, প্রত্যেকবারই তিনি আমাকে হাসিমুখে সম্ভাষণ করেছেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমার কথা শুনেছেন। কারও মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি কথা বলতেন না। একজনের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়ার পর নিজের মন্তব্য প্রকাশ করতেন।

চেহারার মধ্যে এমন একটা জ্যোতি ছিল যে, কেউ কোনদিন তাঁর চোখে-চোখে চেয়েছে, এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র এমনকি শিশুদের সাথেও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কথা বলতেন; সকল শ্রেণির লোকের মর্যাদা প্রদান করতেন। প্রত্যেক আগন্তুকের সাথে উষ্ণ আবেগের সাথে মুসাফাহা করতেন। কিছু দিন বিরতির পর সাক্ষাৎ হলে বুকে বুক লাগাতেন, ললাট চুম্বন করতেন। যে কোনো লোক কথা বলতে গেলে আগ্রহভরে তা শুনতেন। সাহাবীগণের মধ্যে এমন একটি সাধারণ ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোধহয় তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে যখন তিনি ক্ষমতার শীর্ষে তখনও মাঠের রাখাল ছেলে পর্যন্ত মনে করত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার এমন ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব রয়েছে যে, তার যে কোনো আবদার তিনি রক্ষা করবেন। ফলে মরুচারী অমার্জিত স্বভাবের বেদুইনরাও সময়ে-অসময়ে সম্ভব-অসম্ভব নানা প্রকার আবদার নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হতো।

কিন্তু তিনি কখনো কারও প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, এমন কোনো ঘটনা কেউ বর্ণনা করতে পারেনি।

পথে হেঁটে যেতে প্রথমে তিনি সালাম দিতেন। ছোট ছোট বাচ্চাকে ডেকেও কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করতেন। তাদের খেলাধুলা, ছাগলছানা, পালিত পাখির ছানা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে ভুলতেন না। শিশুরাও তাদের আবদারের কথা অকপটে তাঁর কাছে বর্ণনা করত। বিত্ত, বয়স বা সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে যে যেখানেই থাকুক না কেন, নিজের কথা অকপটে আলোচনা করতে এসে মহানবীর সামনে কেউ বিব্রত বোধ করেনি। কোনো শ্রেণির লোক থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখার প্রবণতাও তাঁর মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। অবসর পেলেই তিনি বের হতেন। অলিতে-গলিতে, এমনকি ক্ষেত-খামার এবং পশুপালনের চারণভূমিতে পর্যন্ত গিয়ে সবার সাথে প্রাণখোলা আলাপ করতেন। সকল শ্রেণির মানুষের সমস্যা ও হাসি-কান্নার সাথে আন্তরিকভাবে শরিক হতেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ

তাঁর পোশাক ছিল খুব সাধারণ। মক্কার এতিম সর্বহারার জীবনে তিনি যে ধরনের পোশাক পরতেন, মদীনায় এসে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বরিত হওয়ার পরও সেই পোশাকে কোনো প্রকার পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি। সবসময় লুঙ্গি, চাদর জড়িয়ে রাখতেন। জীবনে কখনো পায়জামা পরেননি, তবে অন্যেরা পরলে তা পছন্দ করতেন।

তাঁর শেষ জীবনে অনেক সময় উপহার হিসেবে অনেক মূল্যবান পোশাক আসত। এগুলো দু'একবার গায়ে দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দিতেন। সাধারণত মোজা ব্যবহার করতেন না। তবে হাবশার অধিপতি নাজাশী কর্তৃক উপহার হিসেবে দেওয়া চামড়ার তৈরি এক জোড়া কালো মোজা মাঝে মাঝে তাঁকে পরতে দেখা গেছে। মাথার সাথে লেগে-থাকা চ্যাপ্টা টুপি ব্যবহার করতেন তিনি। অধিকাংশ সময় টুপির ওপর পাগড়ি বাঁধতেন। ইয়ামানের তৈরি হালকা পাড়যুক্ত চাদর বেশি পছন্দ করতেন। ধূসর, সবুজ এবং সাদা রঙের পোশাক বেশি পছন্দনীয় ছিল। লাল রঙ মোটেও পছন্দ করতেন না।

পানাহার

খাদ্যবস্তুর মধ্যে সিরকা, মধু, তিলের তৈল এবং মিষ্টি পছন্দ করতেন। এগুলো আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করতেন। খেজুর, শশা, তরমুজ প্রভৃতি ফলের প্রতিও আগ্রহ ছিল। তবে সাধারণ খাদ্য ছিল এত সাদাসিধা যে, কোনো দিন ভালো রুটি আহার করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দু'বেলা আহার খুব কমই করতেন। এক বেলা খেলে অন্য বেলা উপবাস দিয়ে কাটানোই ছিল সাধারণ নিয়ম।

মেহমানের ভিড় সবসময় লেগেই থাকত। তা ছাড়া মসজিদে নববী সংলগ্ন কুটিরে যে সমস্ত আত্মনিবেদিত এবং জ্ঞানান্বেষী সাহাবী বাস করতেন, তাদেরকে সাধারণ মুসলমানের সামাজিক মেহমান হিসেবে গণ্য করা হতো। খাওয়ার সময় অন্যান্য মেহমানের সাথে এদের কিছু লোককেও অবশ্যই শরিক করে নিতেন।

খাদ্যবস্তু বড় কোন পাত্রে—সাধারণত কাষ্ঠনির্মিত একটি খাঞ্চায় করে পরিবেশন করা হতো। সেই পাত্রেই সকলকে নিয়ে তিনি একত্রে আহার করতেন। কোনো কোনো সময় সহধর্মিনীগণের অনুরোধে তাদের সাথেও আহারে শরিক হতেন। তবে স্ত্রীদের প্রত্যেককেই সে আহারে শামিল করে নিতেন। পারিবারিক পরিবেশের এ সমস্ত আনন্দঘন অবস্থায়ও মেহমানদের কথা ভুলতেন না। সেই খানা থেকে বাইরে মেহমানদের জন্যে কিছু অংশ পাঠিয়ে দিতেন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ছিল তাঁর প্রকৃতিগত বিষয়। সুগন্ধি ব্যবহার ছিল নিয়মিত অভ্যাস। নোংরামি বা অপরিচ্ছন্নতা অপছন্দ করতেন। যেখানে সেখানে থুথু ফেলতে দেখলে অনেক সময় নিজে তা পরিষ্কার করতেন। কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন, মুলা ইত্যাদির গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না। কেউ যেন এ সমস্ত জিনিস খাওয়ার পরই সাথে সাথে মসজিদে না আসে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

দিবা-রাত্রির কার্যসূচি

দিনরাত্রির তিন ভাগের এক ভাগ সময় ইবাদত-বন্দেগির জন্যে, এক ভাগ পরিবার-পরিজন ও গৃহকর্মের মধ্যে এবং এক ভাগ নিঃস্ব-দুঃস্থজনদের সেবায় ব্যয় করতেন। কোনো জরুরি অবস্থা দেখা না দিলে সাধারণত এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটত না।

ফজরের নামায শেষ হওয়ার পর জায়নামাযেই লোকজনের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বসতেন। এক প্রহর পর্যন্ত এ আসনে বসে সাহাবীগণের প্রতি উপদেশ দিতেন। তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতেন। কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে সে সম্পর্কে পরামর্শ করতেন। এককথায় এ সময়টিই ছিল দরবারে নববীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সময়। বিদেশি প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন গোত্রের তরফ থেকে আগত লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ দানের সময়ও ছিল এটিই। এই বৈঠকেই বিচারাদিও নিষ্পত্তি এবং অভিযোগ শোনা হতো। বৈঠক শেষে চাশতের নামায পড়ে ঘরে ফিরে আসতেন। অতঃপর সাধারণ একজন গৃহীর ন্যায় দৈনন্দিন কাজকর্মে লেগে যেতেন। গৃহপালিত পশুর পরিচর্যা, দুগ্ধ দোহন, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা, বাজার থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করে আনা, পুরনো কাপড় ও জুতো সেলাই করা প্রভৃতি কাজ নিজ হাতেই করতেন।

যোহরের নামাযের আগেই খাওয়ার কাজ সেরে নিয়ে সামান্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন। নামায শেষে পুনরায় মসজিদ বা বাইরে কোথাও গিয়ে তাবলীগ ও তালীমের কাজ করতেন। আসরের নামাযের পর অন্তঃপুরে চলে গিয়ে সহধর্মিনীগণের সাথে কথাবার্তা বলতেন। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আগত মহিলাদের মধ্যে তালীমের কাজ এ সময়ই সমাধা করা হতো। এশার আগেই পর্যায়ক্রমে কোনো এক স্ত্রীর ঘরে পরিবারের সবাইকে নিয়ে কিছুক্ষণ কাটাতেন। এশার নামায শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় চলে যেতেন। এশার পর রাতজাগা তিনি পছন্দ করতেন না।

রাতের অর্ধপ্রহর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠতেন। উজুর পানি ও মেসওয়াক হাতের কাছেই রাখা থাকত। প্রথমে ভালোভাবে মেসওয়াক করতেন। রাত-নিশীথে শয়নের বিছানাই হতো তাঁর নামাযের স্থান।

জীবনের কোনো সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি, বরং কোনো কোনো সময় এশার পর নামমাত্র সামান্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফজর পর্যন্ত শুধু নামায এবং কান্নাকাটি করে কাটিয়েছেন বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়।

বিছানা ও আসবাবপত্র

জীবনের অধিকাংশ সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির ওপর চাটাইয়ের বিছানা করে শুয়েছেন। শেষ বয়সে চামড়ার মধ্যে খেজুর পাতা ও আঁশ ভরে একটি গদি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। এই বিছানাতেই একটি তালি দেওয়া কালো কম্বলে আবৃত অবস্থায় ত্রিভুবনের 'শাহানশাহ' এ দুনিয়া হতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর ঘরে আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল একটি বিছানা, পানি রাখার জন্যে একটি চামড়ার মশক, পানি পান করার একটি কাঠের পেয়ালা এবং কয়েকটি টুকিটাকি অস্ত্র। জীবনের শেষ রাতটিতে তাঁর ঘরে বাতি দেওয়ার মতো তৈল ছিল না, অথচ তিনি ছিলেন লাখো বর্গমাইল বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি।

বাসস্থান

মহানবীর বাসস্থান ছিল মসজিদে নববীর পাশে ছয় হাত চওড়া এবং আট হাত লম্বা কয়েকটি কুটির। এগুলোতে খেজুর পাতার ছাউনি ছিল। একেকটি কুটিরে মুসলিম-জননীগণের একেকজন বাস করতেন। রোদ-বৃষ্টি থেকে পরিপূর্ণভাবে আত্মরক্ষার মতো ব্যবস্থাও এ সমস্ত কুটিরে ছিল না।

বিদেশি মেহমান এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সাথে বসে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে সাহাবীগণ মসজিদে নববীর সামনে আরেকটি কুটির তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেই কুটিরে কয়েকটি শুকনো চামড়ার আসন ছাড়া আর কোনো আসবাব ছিল না।

গোটা আরবের ওপর আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার পর সাহাবীগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত করার

চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো অবস্থাতেই এরূপ করার অনুমতি প্রদান করেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল— দুনিয়ার আরাম-আয়েশের সাথে আমার সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমি একজন মুসাফির ছাড়া তো আর কিছু নই। একজন পথচারী যেমন ছায়াদার কোনো গাছের নিচে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে, মানুষের জীবনটুকুও ঠিক তেমনি। মানুষ এখানে আরাম করার জন্যে আসেনি, এসেছে কঠোর কর্তব্য সমাধা করে অনন্ত জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করতে।

চাঁদের চেয়েও সুন্দর!

সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সুঠাম, সর্বোত্তম দেহাবয়ববিশিষ্ট ছিলেন আল্লাহর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে সুদর্শন কোনো পুরুষ আমি জীবনে দেখিনি। তাঁর পবিত্র চেহারার মধ্যে যেন দ্বিপ্রহরের সূর্য সন্তরণ করতে থাকত। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জীবদ্দশাতে তো বটেই, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরও তাঁর মতো সুপুরুষ আমি আর কখনো দেখিনি।

আল্লাহ তাআলার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলগণ। আল্লাহর এ প্রিয় বান্দাগণের মধ্যে অনন্য ছিলেন আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দৈহিক সৌষ্ঠব এবং চরিত্রমাধুরী, এ উভয় দিক বিচারেই নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ সৃষ্টির সেরা নমুনারূপে তৈরি করেছেন; তেমনি তাঁদের কণ্ঠস্বরও আল্লাহ পাক স্বতন্ত্র মাধুর্যমণ্ডিত করেছেন।

সাহাবী হযরত কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম দেহাবয়ব এবং সে সঙ্গে সর্বাপেক্ষা মধুর কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন। তাঁর আগে বা পরে তাঁর তুল্য আর কেউ ছিলেন না।

মক্কার একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন ওরাকা ইবনে নওফেল। ইনি ছিলেন উম্মত-জননী হযরত খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহুর চাচাতো ভাই এবং মুরব্বি। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, দ্বাদশীর চাঁদের মতো তাঁর মুখমণ্ডল। ললাটদেশ থেকে যেন সৌভাগ্যের আলোকরশ্মি ঠিকরে পড়ছে। গভীর কালো মায়াময় দু'টি চোখ। তাঁর পবিত্র বদনের গন্ধ কস্তুরিকেও হার মানায়। তাঁর কণ্ঠস্বর অপূর্ব। তিনি চলতে শুরু করলে মনে হয় চতুর্দশীর চাঁদ যেন নড়াচড়া করছে। রহমতের বারিধারা যেন আসন্ন হয়ে এসেছে। শারীরিক সৌন্দর্য এবং মহোত্তম গুণে যেমন তিনি অনন্য, তেমনি বংশমর্যাদায়ও অসাধারণ। তাঁর চরিত্রের সাথে তুলনা করার মতো আর কোনো ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণই করেনি এ বিশ্ব-চরাচরে। ভ্রমর-কালো জুলফির ভেতর থেকে তাঁর গোলাপি দু'টি গণ্ডদেশ যেন বিদ্যুৎ ছড়ায়। তাঁর মুখের কথায় মুক্তা ঝরে। তাঁর পবিত্র শরীর মেশক-আম্বরের গন্ধ ছড়ায়।

সাহাবী হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো পথ দিয়ে গেলে বহুক্ষণ পর্যন্ত সে পথে মনমাতানো সুগন্ধ ছড়িয়ে থাকত। শুধু গন্ধ অনুসরণ করেই তাঁকে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হতো না।

সাহাবী হযরত কাব ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর পবিত্র চেহারা এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠত, যেমন নীল আকাশে পূর্ণ চন্দ্র হাসতে থাকে।

ইসলামের কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন—

وأَحسنُ منكَ لم ترَ قطُّ عيني / وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النّسَاءُ

خلقتَ مبرأً منْ كلّ عيبٍ / كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاءُ

'আপনার মতো সুন্দর কোনো মানুষ আর কখনো দেখেনি আমার চোখ।

আপনার চাইতে সুশ্রী কোনো সন্তান কোনো মা কখনো প্রসব করেনি!
কোনো ত্রুটিই আপনাকে স্পর্শ করতে পারেনি।
যেমনটি আপনি চেয়েছিলেন,
তেমনি করেই বুঝি সৃষ্টি করা হয়েছে আপনাকে!'

তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল সূর্যের সাথে তুল্য। অপর দিকে আপন-পর সবার মধ্যেই তিনি নির্মল চাঁদের স্নিগ্ধতা বিতরণ করতেন। এদিক লক্ষ করেই সম্ভবত কোনো কোনো কবি তাঁর পবিত্র চেহারাকে সূর্যের প্রখরতার সাথে, আর কেউ কেউ পূর্ণ চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলোর সাথে তুলনা করেছেন।

সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহুর পৌত্র আবু উবায়দা ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেছিলেন, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা কেমন ছিল? তিনি বলেছিলেন, বৎস, তাঁর পবিত্র চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করলে এরূপ অনুভূত হতো, যেন সূর্য উদিত হচ্ছে—অর্থাৎ, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রখরতা সূর্যের সাথে তুল্য ছিল।

সার্বক্ষণিক সেবক সাহাবী হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাত্রবর্ণে এক ধরনের মনোমুগ্ধকর ঔজ্জ্বল্য ছিল। তাঁর ঘামের ফোঁটা ছিল মুক্তার মতো শুভ্র। পথ চলার সময় সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে চলতেন। তাঁর হাতের তালু ছিল রেশমের চাইতেও মসৃণ। তাঁর গায়ের সুগন্ধ ছিল কস্তুরির চাইতেও অনেক বেশি মনোমুগ্ধকর।

অন্তিম লগ্ন

প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করার দিনটিতে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে দাঁড়িয়েছেন। সকল প্রকার বাতিল মাবুদের গোলকধাঁধা থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে উদ্ধার করে এক রাব্বুল আলামিনের সামনে কাতারবন্দি করার জন্যেই তো ছিল প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ তেইশ বছরের কঠোর সাধনা। হ্যাঁ, আজ আল্লাহর বান্দারা মহান আল্লাহকে চিনতে পেরেছে। সফল হয়েছে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-সাধনা।

জীবনসায়াহ্নে এ সাফল্যের দৃশ্য শেষবারের মতো পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে দেখবার আকুতি নিয়েই হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার কুটিরের পর্দা সরিয়ে দেওয়ার জন্যে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন। দৃষ্টির সামনেই ছিল নামাযের কাতার। এ দৃশ্য দেখে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুগ্‌ণক্লিষ্ট পবিত্র মুখে তৃপ্তি ও আনন্দের যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল, বিভিন্ন প্রামাণ্য কিতাবের পাতায়, সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনার মধ্যে পবিত্র দৃশ্য এখনও বিধৃত হয়ে রয়েছে। *বুখারী শরীফের* আযান অধ্যায়ে উদ্ধৃত হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা আমাদের দৃষ্টিপথে এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যেন পাক কুরআনের খোলা পাতা। আমাদের দেখে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসলেন। পরম তৃপ্তির হাসি। মনে হচ্ছিল, এ হাসির ছটায় আমাদের নামায বুঝিবা ছুটে যায়।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও বর্ণনা করেন, তিন দিন থেকে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইরে আসা বন্ধ ছিল। সাহাবীগণ নামাযে আসতেন। মসজিদে যথারীতি নামায হতো। কিন্তু মেহরাব ও মিম্বরে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না দেখে সবাই হতাশ হয়ে ফিরে যেতেন। চতুর্থ দিনে ফজরের জামাত শুরু হয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ হুজরার পর্দা সরে গেল। কারও কারও দৃষ্টিপথে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা উদ্ভাসিত হলো। এটাই ছিল শেষ দেখা। এরপর আর সেই মোবারক চেহারা কেউ দেখতে পাননি। সেদিনই দ্বিপ্রহরের শেষ মুহূর্তে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

সাহাবী হযরত বারা ইবনে আযেব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চেহারার চাইতে সুন্দর আর কোনো কিছু কোনো দিনই দেখিনি।

হযরত আবুদল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাক্যালাপ করতেন, তখন

তাঁর পবিত্র দাঁতের মধ্য থেকে বিদ্যুচ্চমকের মতো নূরের ঝলক ফুটে বের হতো।

হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়না দেখার সময় বলতেন, সেই মহান আল্লাহর সকল প্রশংসা, যিনি আমার চেহারা এবং অবয়ব নিঁখুত করে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমার আচার-আচরণ ও আদত-অভ্যাস সুসজ্জিত করেছেন।

প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কটুভাষী ছিলেন না। কাউকে তিরস্কার করা ছিল তাঁর অভ্যাসবহির্ভূত। রাগান্বিত হলে বড় জোর আরবী ভাষার একটি বহুল প্রচলিত বাক্য তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হতো, যার অর্থ হয় এমন—এর কী হলো? এর ললাট ধূলিধূসরিত হোক।

কারও ওপর তিনি কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। যে কোনো উপলক্ষে একবার কেউ তাঁর সান্নিধ্যে এলে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারত না। প্রত্যেকের সাথেই তিনি নিজের স্বভাবসুলভ উত্তম ব্যবহার করতেন।

পবিত্র অনুভব!

ইমাম গাযালী রহ. লিখেছেন, প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ক্রন্দনমিশ্রিত যে শোকগাথা উচ্চারণ করেছিলেন, তার এক অংশ ছিল নিম্নরূপ—

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। খেজুর গাছের একটি শুষ্ক কাণ্ড আপনার বিরহে রোদন করেছে। আপনি যখন মমতামাখা হাতের পরশ দিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিলেন, তখনই সেই নিষ্প্রাণ কাষ্ঠখণ্ড শান্ত হয়েছিল।

আজ আপনার উম্মত কি সে কাষ্ঠখণ্ড থেকেও নিষ্প্রাণ যে, তারা আপনার বিরহ-ব্যথায় কাঁদবে না?

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান হোক! আল্লাহর দরবারে আপনার মর্যাদা এতই উচ্চ যে, আল্লাহ স্বয়ং আপনার

আনুগত্যকেই তাঁর আনুগত্যরূপে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনের সাক্ষ্য—

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ.

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার বাবা-মা আপনার জন্যে কোরবান হোক! যদি আপনি আমাদের ন্যায় তুচ্ছ মানুষের সাথে না বসতেন, আমাদেরকে সাথে নিয়ে খানা না খেতেন, আমাদের সাথে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ না হতেন, তবে আমরা আজকের এ অনন্য মর্যাদার অধিকারী কীভাবে হতাম?

সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্যেই তো আপনি পশমের মোটা কাপড় পরিধান করেছেন। মাটিতে দস্তরখান বিছিয়ে খানা খেয়েছেন। গাধার পিঠে সওয়ারি করেছেন। নিজের সাথে অন্যকে সওয়ার করেছেন!

আল্লাহ পাক অবিরাম আপনার প্রতি রহমত নাযিল করুন!

রাসূলুল্লাহর অনুপম দেহাবয়ব

মুসলিম উম্মাহ সাহাবায়ে কেরামের কাছে এজন্য চিরঋণী যে, তারা একদিকে যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যন্তরীণ গুণাবলি তথা আল্লাহপ্রদত্ত অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা, কর্মজীবন ও তত্ত্বপূর্ণ বাণীসমূহ পরবর্তী উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছেন, অপরদিকে তেমনি তাঁর বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য ও অপরূপ দেহাবয়বও উম্মতের সামনে তুলে ধরেছেন।

ইমাম তিরমিযী এই প্রকার চারশো হাদীস সংকলন করে একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা কচ্ছেন। এই চারশো হাদীসকে তিনি ছাপ্পান্নটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রথম অধ্যায়ে চৌদ্দটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। দেহাবয়ব সম্পর্কিত এই হাদীসগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো—

এক. হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব লম্বা ছিলেন না। আবার খুব খাটোও নন, বরং তাঁর উচ্চতা

ছিল মাঝারি। গায়ের রঙ একেবারে চুনের মত সাদা বা গোধূম অথবা শ্যামলা ছিল না (বরং তিনি ছিলেন চতুর্দশী রাতের চাঁদের চেয়ে অধিক উজ্জ্বল, নূরানি ও কমনীয় চেহারার)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ একেবারে সোজা ছিল না বা একেবারে কুঞ্চিতও ছিল না (বরং বলা চলে তাঁর চুল সামান্য কোঁকড়ানো ছিল), আবার পুরোপুরি কোঁকড়ানো ছিল না। চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁকে আল্লাহ তাআলা নবুওয়াত দান করেন। অতঃপর তিনি দশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন (এতে কথা আছে, যা পরে উল্লেখ করা হচ্ছে)। এ সময়ের মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহীও অবতীর্ণ হতে থাকে। এরপর দশ বছর মদীনায় বসবাস করেন। এরপর ষাট বছর বয়সে তিনি পরম প্রভুর সাথে মিলিত হন। তখন তাঁর মাথায় ও দাড়ি মোবারকের পাকা চুলের সংখ্যা বিশটিরও কম ছিল।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক উচ্চতা মাঝারি ধরনের ছিল। হিন্দ ইবনে আবু হালা প্রমুখের রেওয়ায়েতে এ কথা স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে। এ দু'টি রেওয়ায়েতের সাথে অপর একটি রেওয়ায়েতের বিরোধ রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গণজমায়েতে দণ্ডায়মান হতেন, তখন সকলের অপেক্ষা উঁচু দৃষ্টিগোচর হতেন। এই বিরোধের জবাব এই যে, এই উচ্চতা শারীরিক উচ্চতার কারণে ছিল না, বরং এটা ছিল তাঁর মোজেযা, যাতে অভ্যন্তরীণ গুণাবলিতে যেমন কেউ তাঁর চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না, তেমনি বাহ্যিক আকৃতিতেও কেউ তাঁর চেয়ে উঁচু অনুভূত হতো না।

এ ছাড়া এই হাদীসে নবুওয়াত লাভের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা মুকাররমায় দশ বছর অবস্থান করার কথা উল্লিখিত হয়েছে;—এর ভিত্তিতেই তাঁর বয়স ষাট বছর বলা হয়েছে। কিন্তু এই রেওয়ায়েতটি সেই সমস্ত রেওয়ায়েতের খেলাফ, যেগুলোতে তাঁর অবস্থান তেরো বছর এবং বয়স তেষট্টি বছর বলা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বয়স পঁয়ষট্টি বছর বর্ণিত আছে। ইমাম বুখারী বলেন, তেষট্টি

বছরের রেওয়ায়েত বেশি। আলেমগণ দু'প্রকারে এ সকল হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন—

ক. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত পান এবং তিন বছর পরে রেসালাত পান। এরপর তিনি দশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। এ ভিত্তিতে আলোচ্য হাদীসে নবুওয়াত ও রেসালাতের মধ্যবর্তী তিন বছরের উল্লেখ বাদ পড়েছে।

খ. কোনো কোনো ভাষায় সাধারণত সংখ্যাতত্ত্বে একক সংখ্যাগুলো গণনা করা হয় না। এ কারণেই হযরত আনাসের রেওয়ায়েত দশ ও ষাট উভয় জায়গায় দশক উল্লেখ করা হয়েছে এবং একক সংখ্যা বাদ দেওয়া হয়েছে। যে রেওয়ায়েতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স পঁয়ষট্টি বছর উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে জন্মসাল ও মৃত্যুসালকে স্বতন্ত্র গণনা করা হয়েছে। মোটকথা, সকল রেওয়ায়েতের সারকথা একই।

দুই. দ্বিতীয় রেওয়ায়েত হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝারি উচ্চতাবিশিষ্ট ছিলেন—না বেশি লম্বা, না বেশি খর্বাকৃতি। তাঁর দেহ ছিল অত্যন্ত সুশ্রী ও সুষম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ না একেবারে কুঞ্চিত ছিল, না একেবারে সোজা (বরং তাতে কিছু কিছু কুঞ্চন ছিল)। তাঁর শরীরের রঙ ছিল গোধূম। যখন তিনি পথ চলতেন, তখন সম্মুখের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে চলতেন।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে স্বয়ং হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের রঙ ছিল গোধূম। প্রথম রেওয়ায়েতও হযরত আনাসেরই ছিল—তাতে তিনি বলেছিলেন, তাঁর গায়ের রঙ একেবারে গোধূম ছিল না। এতদসত্ত্বেও উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বৈপরীত্ব নেই। উভয় রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রঙ একেবারে গোধূম ছিল না, যে কারণে ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্যে কিছু ত্রুটি থেকে যায়, বরং তাঁর রঙে এমন চাকচিক্য ও উজ্জ্বলতা ছিল, যার সাথে কিছুটা গোধূম রঙও মিশ্রিত ছিল।

এ ছাড়া আলোচ্য হাদীসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ চলার ভঙ্গি সম্পর্কে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—এর অনুবাদে আলেমগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন :—কেউ এর অনুবাদে বলেছেন যে, তিনি দ্রুত চলতেন; কেউ সম্মুখের দিকে নত হওয়ার অর্থ নিয়েছেন; আবার কোনো কোনো টীকাকার তরজমা করেছেন, তিনি শক্তি সহকারে পা উত্তোলন করতেন;—বর্ণিত তিনটি অর্থই শুদ্ধ; কেননা, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলনভঙ্গিতে তিনটি গুণই বিদ্যমান ছিল; শব্দটিও আভিধানিক দিক দিয়ে তিনটি অর্থ বহন করে—হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুতগতিতে চলতেন, মহিলাদের চলন ভঙ্গির অনুরূপ চলতেন না; এ ছাড়া তিনি নত হয়ে চলায়ও অভ্যস্ত ছিলেন, দাম্ভিকসুলভ ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে চলতেন না; তদুপরি পুরুষোচিত ভঙ্গিতে পা মাটি থেকে তুলে পথ চলতেন, তিনি পা টেনে টেনে চলতেন না।

তিন. হযরত বারা ইবনে আযেব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন (সামান্য লম্বাটে যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে অন্যের তুলনায় কিছুটা বেশি দূরত্ব ছিল (যদ্দ্বারা বক্ষ প্রশস্ত হওয়ার বিষয়টি জানা যায়)। তিনি স্বর্ণকেশী ছিলেন এবং তাঁর কেশ কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিল। তাঁর গায়ে লাল পাড়বিশিষ্ট এক জোড়া বস্ত্র ছিল—অর্থাৎ, লুঙ্গি ও চাদর। আমি তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর কোনো কিছু কখনো দেখিনি।

ব্যাখ্যা : হাদীসে ব্যবহৃত শব্দটি জিমের পেশসহ এর অনুবাদ করা হয়েছে ব্যক্তি—এটা শুদ্ধ হতে পারে। এ ধরনের শব্দ আরবীভাষায় সংযোগের অর্থেও ব্যবহৃত হয়; কিন্তু এর দ্বারা কোনো বিশেষ গুণ প্রকাশ পায় না বিধায় কোনো কোনো হাদীসবিদের অভিমত এই যে, শব্দটি জিমের যবরসহ পড়তে হবে, যার অর্থ সোজা ও কুঞ্চিত হওয়ার মধ্যবর্তী অবস্থা। এমতাবস্থায় শব্দটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ মোবারকের সামান্য কুঞ্চন ছিল।

এই হাদীস দ্বারা কোনো কোনো আলেম পুরুষের জন্য লাল কাপড় পরিধান করা সর্বাবস্থায় জায়েয প্রতিপন্ন করেছেন। হানাফী আলেমগণের মতে এটা সর্বাবস্থায় জায়েয নয়, বরং কতক অবস্থায় জায়েয ও কতক অবস্থায় নাজায়েয। কাপড় নির্দিষ্ট করার পর এটা আলেমগণের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

এই হাদীসে সাহাবী বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর কোনো কিছু কখনো দেখিনি। এখানে বলা হয়েছে, যাতে মানুষ ছাড়া চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিও শামিল হয়ে যায়।

চার. হযরত বারা ইবনে আযেব রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, আমি কোনো বাবরিওয়ালাকে লাল বস্ত্র জোড়ার মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর দেখিনি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী অংশ কিছুটা বেশি প্রশস্ত ছিল এবং তিনি না অধিক লম্বা ছিলেন, না বেঁটে।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ মোবারক সম্পর্কে এই হাদীস পূর্বের হাদীস থেকে ভিন্নতর। কেননা, পূর্বের হাদীসে কানের লতি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু আসলে এ দুই হাদীসে কোনো বিরোধ নেই। কেননা, চুল এক অবস্থায় থাকে না, কখনো কম এবং কখনো বেশি লম্বা হয়ে যায়। ইচ্ছাকৃতভাবেও চুল কখনো খাটো করা হয় এবং কখনো বাড়ানো হয়। এমনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দু'হাদীসে দু'রকম কথা বলা হয়ে থাকতে পারে।

পাঁচ. হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না অধিক লম্বা ছিলেন, না বেঁটে। তাঁর হাতের তালু ও পদযুগল মাংসল ছিল (এসব গুণ পুরুষদের জন্য প্রশংসনীয়। কেননা, এগুলো শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের প্রতীক। পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য এসব গুণ নিন্দনীয়)। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথাও বড় ছিল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গ্রন্থির অস্থিও বড় ছিল। বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত চুলের একটি সরু ডোরা ছিল। তিনি যখন পথ চলতেন, মনে হতো, যেন কোনো

উঁচু জায়গা থেকে নিচে অবতরণ করছেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাঁর মতো ব্যক্তি না পূর্বে দেখেছি, না পরে।

ব্যাখ্যা : 'আমি তাঁর মতো ব্যক্তি কখনো দেখিনি'—এ ধরনের বাক্য দ্বারা অতুলনীয় হওয়ায় অতিশয়োক্তি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলির ব্যাপারে অতিশয়োক্তি নেই। কেননা, তাঁর গুণ ও উৎকর্ষ বর্ণনার ঊর্ধ্বে। **মুনাভী লেখেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করতে আদিষ্ট যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীর যে সকল উৎকৃষ্ট** গুণে গুণান্বিত, সে সকল গুণে তাঁর সমকক্ষ অন্য কেউ হতে পারে না—এটা নিছক বিশ্বাসগত ব্যাপার নয়, সীরাত, হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলি এ বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁকে অভ্যন্তরীণ গুণাবলির সাথে বাহ্যিক সৌন্দর্যও পূর্ণ মাত্রায় দান করেছিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে দু'পঙ্‌ক্তি কবিতা বর্ণিত আছে। এগুলোর মর্মার্থ এই—

'জুলায়খার সখীরা যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দেখত, তবে অঙ্গুলির পরিবর্তে আপন আপন অন্তর কেটে ফেলত—এ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য।'

ছয়. হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর পৌত্র ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ বলেন, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহাবয়ব বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না অধিক লম্বা ছিলেন, না অধিক বেঁটে, বরং মাঝারি গড়নের লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর পবিত্র কেশ একেবারে কুঞ্চিতও ছিল না, একেবারে সোজাও ছিল না, বরং তাতে সামান্য কুঞ্চন ছিল। তিনি না স্থূল দেহের অধিকারী ছিলেন, না তাঁর মুখমণ্ডল গোলাকার ছিল; তবে অল্পবিস্তর গোলাকার ছিল এবং একেবারে লম্বাও ছিল না, বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রঙ লালচে সাদা ছিল। তাঁর পবিত্র চক্ষু অত্যধিক কৃষ্ণবর্ণ ছিল। পলক দীর্ঘ এবং গ্রন্থি সংযোজনের অস্থি মোটা ও সবল ছিল (যেমন : কনুই ও হাঁটু)। এমনিভাবে উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী জায়গাও মোটা ও

মাংসল ছিল। তাঁর শরীরে (সাধারণভাবে যা থাকে, তার চেয়ে বেশি) চুল ছিল না (অর্থাৎ কোনো কোনো মানুষের শরীরে চুল বেশি থাকে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ—যেমন : বাহু, পায়ের গোছা ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোথাও চুল ছিল না)। তাঁর পবিত্র বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত চুলের রেখা ছিল। তাঁর হাত ও পা মাংসল ছিল। যখন তিনি হাঁটতেন, তখন পদযুগলকে শক্তি সহকারে উত্তোলন করতেন, যেন নিম্ন দিকে অবতরণ করছেন। যখন তিনি কারও দিকে মুখ ফেরাতেন, তখন সম্পূর্ণ শরীরসহ মুখ ঘোরাতেন (অর্থাৎ কেবল ঘাড় ফিরিয়ে কারও দিকে মনোনিবেশ করতেন না। কেননা, এভাবে অন্যের প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করা হয় এবং কখনো অহংকারসুলভ অবস্থা হয়ে যায়, বরং তিনি বক্ষসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দিকে তাকাতেন। কোনো কোনো আলেম এর অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন, যখন তিনি কারও দিকে তাকাতেন, তখন সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলসহ ঘুরে তাকাতেন, চোখের কোণ দিয়ে দেখতেন না। কিন্তু এই অর্থ সার্থক নয়)। তাঁর উভয় পবিত্র স্কন্ধের মাঝখানে নবুওয়াতের মোহর ছিল। তিনি নবীগণের সিলসিলা খতমকারী ছিলেন। তিনি সর্বাধিক হৃদয়বান দাতা ছিলেন, সর্বাধিক সত্যভাষী ছিলেন, সর্বাধিক কোমল মনের অধিকারী ছিলেন এবং সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন (মোটকথা, তিনি হৃদয়, ভাষা, মন, পরিবার এবং সত্তাগত ও বংশগত গুণাবলিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন)। যে ব্যক্তি হঠাৎ তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করত, সে ভীত হয়ে যেত (অর্থাৎ তাঁর গাম্ভীর্য এত বেশি ছিল যে, প্রথমবার যে দেখত, সে ভক্তিপ্রযুক্ত ভীতির কারণে আতঙ্কিত হয়ে যেত। প্রথমত রূপ ও সৌন্দর্যের জন্যও ভীতি হয়। এর সাথে গুণাবলি সংযুক্ত হলে ভীতি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে সকল বিশেষ নেয়ামত দান করা হয়েছিল, তন্মধ্যে ভীতিও ছিল একটি, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছিল); তবে যে ব্যক্তি পরিচিত হয়ে তাঁর সাথে মেলামেশা করত, তিনি তাঁকে উৎকৃষ্ট চরিত্র ও মধুর ব্যবহারের দরুন আপনজন করে নিতেন। তাঁর দেহাবয়ব বর্ণনাকারী কেবল এ কথা বলতে পারেন, আমি হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো সৌন্দর্যময় ও গুণময় ব্যক্তিত্ব তাঁর পূর্বেও দেখিনি এবং তাঁর পরেও দেখিনি।

সাত. হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমার মামা হিন্দ ইবনে আবু হালাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহাবয়ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব অধিক পরিমাণ এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতেন। আমার বাসনা হলো, তিনি এসব উৎকৃষ্ট গুণের কিছু অংশ আমার কাছেও বর্ণনা করুন, যাতে আমি তার বর্ণনাকে নিজের মধ্যে প্রয়োগ ও গ্রহণ করি এবং কিছু গুণ আয়ত্ত করে সম্ভব হলে নিজের মধ্যে সেগুলো সৃষ্টি করার প্রয়াস পাই।

(রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় হযরত হাসানের বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। বয়সের এই স্বল্পতার দরুন তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎকৃষ্ট গুণাবলি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং সেগুলো সংরক্ষণ করার সুযোগ পাননি)।

মামা বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বগুণে গুণান্বিত মহৎ ছিলেন এবং অপরের দৃষ্টিতেও অনেক মর্যাদাবান ছিলেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমল করত। তাঁর পবিত্র গড়ন সম্পূর্ণ মাঝারি গড়নবিশিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে কিছুটা লম্বা থাকলেও অধিক লম্বা গড়নের ব্যক্তির মতো ছিল না। মস্তক মোবারক সুষম পর্যায়ে বড় ছিল। কেশ মোবারক সামান্য কুঞ্চিত ছিল। যদি মাথার চুলে আপনাআপনি সিঁথি হয়ে যেত, তবে তা থাকতে দিতেন নতুবা তিনি নিজে যত্নবান হয়ে সিঁথি তৈরি করতেন না (এটা প্রসিদ্ধ অনুবাদ। এতে খটকা লাগে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছাকৃতভাবে সিঁথি তৈরি করা বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। এই খটকার জবাবে আলেমগণ বলেন, প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিঁথি তৈরি করার প্রতি যত্নবান ছিলেন না। পরবর্তী যুগে ইচ্ছাকৃতভাবে সিঁথি তৈরি করেছেন। কিন্তু অধমের মতে এর সমাধান মুশকিল। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি মুশরিকদের বিরোধিতা করতেন এবং কিতাবিদের সাথে মিল রেখে ক্রিয়াকর্ম করতেন। তাই সিঁথি না করাই ছিল তাঁর অভ্যাস। পরবর্তীকালে তিনি এই অভ্যাসের পরিবর্তন করেন এবং সিঁথি তৈরি করতে শুরু করেন। তাই কোনো কোনো আলেমের মতে উত্তম

তরজমা এই, যদি অনায়াসে সিঁথি তৈরি হতো, তবে সিঁথি তৈরি করতেন। আর যদি কোনো কারণে অনায়াসে তৈরি না হতো, বরং চিরুনি ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দিত, তবে তখনকার মতো সিঁথি তৈরি করতেন না। অন্য সময়ে চিরুনি ইত্যাদি মজুদ থাকলে সিঁথি তৈরি করতেন)। যে সময়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল বেশি হতো, তখন তা কানের লতি অতিক্রম করে যেত। তাঁর রঙ ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং ললাট প্রশস্ত। তাঁর ভুরু ছিল বক্র, সরু ও ঘন; উভয় ভুরু আলাদা আলাদা ছিল, পরস্পর-সংযুক্ত ছিল না; উভয়ের মাঝখানে একটি শিরা ছিল, যা ক্রোধের সময় ভেসে উঠত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাসিকা সামান্য উঁচু ছিল এবং এতে এক প্রকার চমক ও নূর ছিল। প্রথমে যে দেখত, সে তাঁকে বড় নাকওয়ালা মনে করত; কিন্তু গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানা যেত যে, সৌন্দর্য ও চমকের কারণে নাক উঁচু মনে হয় নতুবা আসলে বেশি উঁচু নয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মোবারক ভরপুর ও ঘন ছিল। চোখের পুত্তলি ছিল অত্যন্ত কালো। গণ্ডদেশ সমতল ও হালকা ছিল এবং গোশত ঝুলন্ত ছিল। তাঁর মুখ সুষম পর্যায়ে প্রশস্ত ছিল (অর্থাৎ সংকীর্ণ ছিল না)। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দন্ত মোবারক চিকন ও মসৃণ ছিল এবং সামনের দাঁতগুলোর মাঝে কিছু কিছু ফাঁক ছিল। বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত চুলের একটি রেখা ছিল। তাঁর গ্রীবা মোবারক মূর্তির গ্রীবার মতো সুশ্রী ও সরু ছিল। এর রঙ ছিল রৌপ্যের মতো পরিষ্কার ও সুন্দর। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুষম ও মাংসল ছিল এবং শরীর ছিল সুঠাম। তাঁর পেট ও বক্ষ ছিল সমতল এবং বক্ষ প্রশস্তও ছিল। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে কিছুটা বেশি ব্যবধান ছিল। গ্রন্থি ও অস্থিসমূহ শক্ত ও বড় ছিল (যা শক্তি সামর্থ্যের প্রমাণ হয়ে থাকে)। বস্ত্র খোলা অবস্থায় তাঁর শরীর উজ্জ্বল ও দীপ্ত দৃষ্টিগোচর হতো (অথবা শরীরের যে অংশ বস্ত্রাবৃত হতো না, তা উজ্জ্বল দেখাত; বস্ত্রাবৃত অংশের তো কথাই নেই। আমার মতে, এই তরজমা ভালো)। নাভি ও বক্ষের মাঝখানে একটি রেখার মতো চুলের সরু ডোরা ছিল—এই রেখা ছাড়া

উভয় ছাতি ও পেট কেশমুক্ত ছিল, তবে উভয় বাহু, কাঁধ বুকের উপরিভাগে চুল ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবজি দীর্ঘ এবং হাতের তালু প্রশস্ত ছিল। এ ছাড়া হাতের তালু ও উভয় পা কোমল ও মাংসল ছিল। হাত পায়ের অঙ্গুলিগুলো সমন্বিতরূপে লম্বা ছিল। পায়ের পাতা কিছুটা গভীর এবং পা সমতল ছিল। পরিচ্ছন্নতা ও মসৃণতার কারণে তাতে পানি আটকে থাকত না, সাথে সাথে গড়িয়ে পড়ত। তিনি যখন পথ চলতেন, তখন শক্তি সহকারে পা তুলতেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকে গমন করতেন। তাঁর পা সজোরে না পড়ে আস্তে মাটিতে পড়ত। তাঁর চলার গতি ছিল দ্রুত এবং পদক্ষেপ হতো অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। তিনি ছোট কদমে চলতেন না। তাঁর চলার সময় মনে হতো, যেন তিনি উচ্চ ভূমি থেকে নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করছেন। যখন কোনো দিকে মুখ ঘোরাতেন, তখন সম্পূর্ণ শরীরসহ ঘোরাতেন। তাঁর দৃষ্টি নত থাকত এবং আকাশের চেয়ে মাটির দিকে অধিক নিবদ্ধ থাকত (এতে খটকা এই যে, *আবু দাউদ শরীফে* আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই আকাশের দিকে তাকাতেন। জবাব এই যে, মাটির দিকে দৃষ্টি রাখাই ছিল তাঁর অভ্যাস। কিন্তু ওহীর অপেক্ষায় তিনি প্রায়শ আকাশপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন; নতুবা সাধারণ অবস্থায় তাঁর অভ্যাস ছিল দৃষ্টি নিম্নগামী রাখা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত চোখের এক পার্শ্ব দিয়ে দেখতেন (অর্থাৎ লজ্জা ও শরমের কারণে তিনি সম্পূর্ণ চক্ষু খুলে দেখতেন না)। চলার সময় তিনি সাহাবীগণকে সামনে রেখে নিজে পেছনে থাকতেন। যার সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তাকে অগ্রে সালাম করতেন।

ব্যাখ্যা : আলেমগণ বলেন, ভদ্রতা প্রদর্শনার্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে অগ্রে রেখে নিজে পেছনে থেকে যেতেন; কিন্তু এ অধমের মতে একে সফরকালীন অবস্থা ধরে নেওয়া অধিক উপযুক্ত; কেননা, সফরে তাঁর অভ্যাস ছিল পশ্চাতে গমনকারী দুর্বলদের দেখাশোনা করার জন্য পেছনে থেকে যাওয়া—এ হাদীসটি বেশ দীর্ঘ;—এতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব, চরিত্র,

অভ্যাস ইত্যাদি সবকিছুই উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে একে কয়েকটি অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। সে মতে এর কিছু অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তার অধ্যায়ে এবং কিছু তাঁর বিনয়ের অধ্যায়ে বর্ণিত হবে।

আট. জাবির ইবনে সামুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশস্ত মুখের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চোখের সাদা অংশে সরু লাল রেখা ছিল। পায়ের গোড়ালিতে খুব কম মাংস ছিল।

ব্যাখ্যা : আরবদের কাছে পুরুষদের জন্য প্রশস্ত মুখ হওয়া পছন্দনীয়। কোনো কোনো আলেমের মতে এই স্থলে প্রশস্ত মুখ হওয়ার অর্থ বিশুদ্ধভাষী হওয়া। চোখের প্রশংসায় যে তরজমা করা হয়েছে, তা বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী লেখা হয়েছে নতুবা এর অনুবাদে ইমাম তিরমিযী এই হাদীসের জনৈক রাবী থেকে 'প্রশস্ত চোখ' অর্থ করেছেন—এটা ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে ভ্রান্ত।

নয়. জাবির ইবনে সামুরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, আমি একবার চাঁদনি রাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরীক্ষণ করছিলাম। তিনি তখন লাল বস্ত্রজোড়া পরিহিত ছিলেন। আমি একবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম, একবার তাঁর দিকে। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ অপেক্ষাও অনেক বেশি সুন্দর, সুশ্রী ও নূরোজ্জ্বল।

দশ. আবু ইসহাক বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত বারা ইবনে আযেব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখমণ্ডল তরবারির মতো উজ্জ্বল ছিল কি?

বারা বললেন, না, বরং পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল ও গোলাকার ছিল।

ব্যাখ্যা : তরবারির উপমায় ত্রুটি ছিল এই যে, এতে মুখমণ্ডল অধিক লম্বা হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হতো। এ ছাড়া তরবারির চমকে শুভ্রতা প্রবল থাকে, নূরের ঔজ্জ্বল্য থাকে না। তাই হযরত বারা তরবারির উপমা প্রত্যাখ্যান করে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন। সত্য বলতে কি,

এসব উপমার উদ্দেশ্য নিছক শ্রোতাকে বাস্তবের কাছে পৌঁছানো নতুবা এক চাঁদ তো ছাই, হাজার চাঁদের মধ্যেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নূর থাকতে পারে না। জনৈক আরব কবি বলেন—

'যদি তুমি প্রশংসিত ব্যক্তির প্রতি দোষারোপই করতে চাও, তবে একে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করো। তার প্রতি দোষারোপ করার জন্য এটাই যথেষ্ট।'

এগারো. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার, স্বচ্ছ, সুশ্রী ও সুন্দর ছিলেন। মনে হতো, যেন তাঁর শরীর মোবারক রৌপ্য দ্বারা নির্মিত হয়েছে। তাঁর কেশ মোবারক কিছুটা কুঞ্চিত ছিল।

ব্যাখ্যা : এ অধ্যায়ে বর্ণিত হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রঙ একেবারে সাদা ছিল না। তাই আলোচ্য হাদীসের অর্থ এরূপ নয় যে, রৌপ্যের মতো সম্পূর্ণ সাদা রঙ ছিল, বরং লালচে সাদা ছিল এবং চমক ও সৌন্দর্য প্রবল ছিল।

বারো. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তি বর্ণনা করেন, আমার সামনে পয়গম্বরগণকে উপস্থিত করা হয়েছে—অর্থাৎ আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দেখলাম;—তিনি সামান্য পাতলা ও শীর্ণদেহী ছিলেন; মনে হচ্ছিল, যেন তিনি শানুয়া গোত্রের একজন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখলাম;—এক্ষণে আমার দৃষ্টিতে যত লোক রয়েছেন, তাদের মধ্যে ঈসা আলাইহিস সালাম ওরওয়া ইবনে মাসউদের সাথে অধিক মিল রাখেন বলে মনে হলো। আমি হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে দেখলাম;—আমার দেখা লোকদের মধ্যে আমি নিজেই তাঁর সাথে অধিক সদৃশ। এমনিভাবে জিবরাঈল আলাইহিস সালামকেও দেখলাম;—তাঁর সাথে অধিক সদৃশ্য আনে আমার দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তি হচ্ছে দিহইয়া কালবী।

ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পয়গম্বরগণকে দেখার এই ঘটনা মেরাজ রজনীতে সংঘটিত হয়েছে অথবা স্বপ্নাবস্থায় হয়েছে। *বুখারী শরীফে* উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে। বিভিন্নতায় কোনো খটকা নেই। কেননা, হতে পারে, এই দেখা দু'বার হয়েছে—একবার মেরাজে এবং একবার স্বপ্নে।

মূসা আলাইহিস সালামের বর্ণনায় আমি 'শীর্ণদেহী' তরজমা করেছি। এর তরজমায় অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। তবে যে তরজমাটি আমার কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, আমি এখানে তা-ই উল্লেখ করেছি।

উপরোক্ত তিনজন পয়গম্বরগণের নাম উল্লেখ করার কারণ এই যে, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন বনী ইসরাঈলের পয়গম্বর। আর হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বপুরুষ। সমগ্র আরব তাঁকে মান্য করত।

তেরো. সাঈদ জুরাইরী বলেন, আমি আবু তোফায়েল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা দেখেছে, তাদের মধ্যে এখন আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ অবশিষ্ট নেই[১]। এ কথা শুনে আমি তাকে বললাম, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়বের কিছু আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ের রঙ ছিল কমনীয়তা সহকারে সাদা—অর্থাৎ লালচে। আর তাঁর শরীর ছিল সুষম।

চৌদ্দ. ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখের দন্ত মোবারক কিছুটা প্রশস্ত ছিল—অর্থাৎ এগুলোতে কিছু পরিমাণে ফাঁক ছিল, ঘন ছিল না। যখন তিনি কথা

---

১ আবু তোফায়েল রাযি. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সকলের শেষে ওফাত পান। ১১০ হিজরীতে তাঁর ওফাত হয়। এ কারণেই তিনি বললেন, এখন আমি ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট নেই, যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে।

আলেমগণ বলেন, 'পৃথিবীতে' শব্দটি যোগ করার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, এমন এক ব্যক্তি তখনও আকাশে জীবিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি হলেন হযরত ঈসা আ.।

বলতেন, তখন যেন নূর প্রকাশ পেত, যা দন্তসমূহের মধ্যস্থল থেকে বিচ্ছুরিত হতো।

ব্যাখ্যা : আলেমগণের মতে এটি একটি উপমা। এখানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁতের মধ্যস্থল থেকে বিচ্ছুরিত কথাকে নূরের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লামা মুনাভীর অভিমত এই যে, এটা উপমা নয়, বরং কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ছিল, যা মোজেযাস্বরূপ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁতের মধ্যস্থল থেকে নির্গত হতো।

মোটকথা, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহাবয়বের প্রতিটি বস্তু সৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষে উপনীত ছিল—অর্থাৎ, তিনি অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যে যেমন চরম সীমায় অবস্থান করছিলেন, তেমনি বাহ্যিক রূপমাধুরীতেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনন্য বৈশিষ্ট্য

ইমাম নববী রহ. *তাহযীব* কিতাবে লেখেন, আল্লাহ তাআলা চরিত্র ও অভ্যাসের সকল মাধুর্য ও উচ্চ গুণাবলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যত গুণ-গরিমা কল্পনা করা যায়, সে সবগুলো দ্বারাই তাঁকে ভূষিত করেছিলেন; অথচ তিনি ছিলেন উম্মী—কিছু লিখতে বা পাঠ করতে পারতেন না। মানবকুলের মধ্যে কেউ তাঁর গুরু ছিল না। এতদসত্ত্বেও তাঁকে এমন জ্ঞান দান করা হয়, যা সমগ্র সৃষ্টিজগতে কাউকে দেওয়া হয়নি। তাঁকে ভূমণ্ডলের রত্নভাণ্ডারসমূহের চাবি পেশ করা হয়, কিন্তু তিনি পার্থিব ধনৈশ্বর্যের বদলে সর্বদা পরকালকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত ছিলেন। তিনি সর্বাধিক সম্মানকারী, সর্বাধিক ন্যায়বিচরক, সর্বাধিক মননশীল ও সংযমশীল, সর্বাধিক সৎ, মানুষের সর্বাধিক উপকারকারী এবং মানুষের নির্যাতন ও উৎপীড়নে সর্বাধিক সবরকারী ও ধৈর্যশীল ছিলেন।–*ওসায়েলুল ওসুল ইলা শামায়িলির রাসূল*

বুখারী ও *মুসলিমে* হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সুশ্রী, বীর ও উদারপ্রাণ ছিলেন। কারণ, তিনি সকল মানবের সেরা মানব এবং সর্বাধিক মিতাচারী ছিলেন। এমন সব মহতী গুণে গুনান্বিত ব্যক্তির কর্ম ও আচার-আচরণই তো সর্ব মানবের জন্য আদর্শ হয়ে থাকে। তাঁর মধ্যে যাবতীয় দৈহিক ও আধ্যাত্মিক গুণ সন্নিবেশিত ছিল এবং তিনি সৌন্দর্য ও অনুপম চরিত্রমাধুর্যের বাহক ছিলেন। তিনি সর্বাধিক উদার, সর্বাধিক ভদ্র ও সর্বাধিক দানশীল ছিলেন।

শ্রেষ্ঠ চরিত্র

আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎকৃষ্ট চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলির প্রশংসা করে বলেছেন—

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।–সূরা আল-কালাম (৬৮) : ৪

আরও বলেছেন—

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ

আপনার জন্য আল্লাহ তাআলার অপরিসীম প্রতিদান রয়েছে।–সূরা আল-কালাম (৬৮) : ৩

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

উকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলিকে পূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।–*মুসনাদে বাযযার*

এ থেকে জানা গেল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় সুন্দর ও উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। কেননা, তাঁর প্রত্যক্ষ শিক্ষাদাতা আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন—

كان خلقه القرآن.

তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।

এর বাহ্যিক অর্থ এই, কুরআন পাকে বর্ণিত সকল প্রশংসনীয় চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা তিনি গুণান্বিত ছিলেন।

কাযী আয়ায রহ. *কিতাবুশ শিফায়* আরও উল্লেখ করেন, (আরও এই যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি ছিল কুরআন পাকের সন্তুষ্টির সাথে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি ছিল কুরআনের অসন্তুষ্টির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদ্দেশ্য এই, তাঁর সন্তুষ্টি ছিল খোদায়ি আদেশ পালনের মধ্যে এবং অসন্তুষ্টি ছিল খোদায়ি আদেশ লঙ্ঘনে ও পাপ কর্মের মধ্যে।

আধ্যাত্ম জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য কিতাব *আওয়ারেফুল মাআরেফে* আছে, উপরোক্ত বাক্য দ্বারা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কুরআনের মধ্যেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র নিহিত ছিল।

সত্য ঘটনা এই, কারও বিবেক-বুদ্ধি ও অনুমান হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার মহান স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কেউ এর স্বরূপ চিনতেও পারে না এবং যেমন আল্লাহ তাআলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো যথার্থভাবে আর কেউ চিনতে পারেনি।

এর যথার্থ অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।–*মাদারিজুন নবুওয়াত* : আব্দুল হক দেহলভী

সহনশীলতা ও ক্ষমা

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবর, সহনশীলতা ও ক্ষমার গুণাবলি নবুওয়াতের মহোত্তম গুণাবলির অন্যতম।

হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিংবা ধনৈশ্বর্যের খাতিরে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেননি; কিন্তু এমন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন, যে আল্লাহর হালাল করা বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছে; আর এ ধরনের লোকের কাছ থেকে আল্লাহর ওয়াস্তেই প্রতিশোধ নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক কঠিন সবর ছিল ওহুদ যুদ্ধে, যেখানে কাফেররা তাঁর সাথে যুদ্ধ ও মোকাবেলা করে এবং গুরুতর কষ্ট দেয়; কিন্তু তিনি কেবল সবর ও ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তাদের প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করে তাদের এ অন্যায় ও মূর্খতাপ্রসূত কাজকে ক্ষমার্হ সাব্যস্ত করে বলেছেন—

اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون.

হে আল্লাহ, আমার সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করুন। কেননা, ওরা অজ্ঞ।

এক রেওয়ায়েতে আছে, হে আল্লাহ, ওদেরকে ক্ষমা করুন।

কিন্তু ব্যাপারটি সাহাবায়ে কেরামের কাছে অসহনীয় ঠেকে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি ওদের জন্য বদদোয়া করুন, যাতে ওরা নির্মূল হয়ে যায়। তিনি জবাব দিলেন, আমি অভিসম্পাত করার জন্য প্রেরিত হইনি, বরং আমি সত্যের দাওয়াত ও বিশ্বজাহানের জন্যে রহমতরূপে প্রেরিত হয়েছি।–*শিফা*; *মাদারিজুন নবুওয়াত*

ধৈর্য ও স্থৈর্য

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর পথে আমাকে যতটুকু ভয় দেখানো হয়েছে, ততটুকু অন্য কাউকে দেখানো হয়নি। আল্লাহর পথে আমাকে যতটুকু নির্যাতিত করা হয়েছে, ততটুকু অন্য কাউকে করা হয়নি। একবার ত্রিশটি দিবা-রাত্র আমার এমন অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমার ও বেলালের জন্যে এমন কোনো আহার্য বস্তু ছিল না, যা কোনো প্রাণী খেতে

পারে, সেই বস্তু ছাড়া, যা বেলাল তার বগলে লুকিয়ে রেখেছিল। –*মাআরিফুল হাদীস; শামায়েল*

মহাবিজয়ের দিন

মক্কার কাফেররা একুশ বছর পর্যন্ত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর নাম উচ্চারণকারীদের ওপর নির্যাতন চালাতে থাকে। জুলুম ও উৎপীড়নের এমন কোনো পদ্ধতি ছিল না, যা ওরা প্রয়োগ করেনি। অবশেষে ওরা তাঁকে বাস্তুভিটা ও স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের এই জঘন্য শত্রুদল পুরোপুরিভাবে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও কৃপার পাত্র হয়ে পড়ে। তাঁর একটি অঙ্গুলির ইশারা ওদের সবাইকে রক্তগঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে পারত। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে কী!

এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ কুরাইশ-সরদাররা ভয় ও অনুশোচনার ভারে মাথা নত করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দণ্ডায়মান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমার নিকট কীরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?

ওরা সম্মিলিত কণ্ঠে জবাব দিল, হে সত্যবাদী, হে বিশ্বস্ত, আপনি আমাদের সম্ভ্রান্ত ভাই, সম্ভ্রান্ত ভ্রাতুষ্পুত্র। আমরা সর্বদাই আপনাকে দয়ালরূপে পেয়েছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অদ্য আমি তোমাদের তা-ই বলব, যা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর ভ্রাতাদের বলেছিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। যাও, আজ তোমরা সকলেই মুক্ত।–*শিফা; সীরাতে ইবনে হিশাম*

প্রকৃতিগত সুস্থতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল আচরণ ও অভিব্যক্তিতে কবীরা গুনাহ থেকে এবং সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণের মতে সগীরা গুনাহ থেকেও নিষ্পাপ ছিলেন। ওয়াদার খেলাফ করা অথবা কারও হক

থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া তাঁর জন্যে সম্ভবপরই ছিল না—না ইচ্ছাকৃতভাবে, না ভুলক্রমে, না সুস্থ অবস্থায়, না অসুস্থ অবস্থায়, না রাগান্বিত অবস্থায়।–*নাশরুত তীব*

অঙ্গীকার পালন

বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা খুবই সামান্য ছিল। এ মুহূর্তে একজন লোক পাওয়াও ছিল আনন্দের বিষয়। হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ও অপর একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা মক্কা থেকে এসেছি। পথিমধ্যে কাফেররা আমাদেরকে গ্রেফতার করেছিল। অবশেষে এই শর্তে মুক্তি দিয়েছে যে, আমরা যুদ্ধে আপনার পক্ষে যোগদান করব না; কিন্তু এটা তো ছিল অপারগ অবস্থার অঙ্গীকার! আমরা অবশ্যই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কখনোই নয়; তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে যাও। আমরা মুসলমানদের কৃত অঙ্গীকার সর্বাবস্থায় পালন করব। আমাদের কেবল আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রয়োজন।–*সহীহ মুসলিম*

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হাম্মাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবুওয়াত লাভের পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে কোনো বস্তু ক্রয় করেছিলাম, কিছু মূল্য বাকি ছিল। আমি ওয়াদা করলাম যে, অবশিষ্ট মূল্য নিয়ে আমি এ স্থানেই উপস্থিত হব। এরপর ঘটনাক্রমে কথাটা বেমালুম ভুলে গেলাম। তিন দিন পর স্মরণ হওয়ায় আমি সেখানে পৌঁছে দেখি, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বিদ্যমান আছেন। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছ। তিন দিন ধরে আমি এখানে তোমার অপেক্ষায় আছি। –*আবু দাউদ*

এ ঘটনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয় ও ওয়াদা পালনের চূড়ান্ত নমুনা রয়েছে।–*মাদারিজুন নবুওয়াত*

বীরত্ব

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে অন্য লোকের ওপর চার বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে—দানশীলতা, বীরত্ব, পৌরুষশক্তি ও বিপক্ষের ওপর প্রাধান্য। তিনি নবুওয়াতের পূর্বে এবং নবী থাকাকালেও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। *–নাশরুত তীব*

হুনাইন যুদ্ধের সময় কাফেররা অবিশ্রান্ত তির বর্ষণ করে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে একপ্রকার অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে দিয়েছিল। কিন্তু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অবস্থান একটুও পরিবর্তন করেননি। তিনি একটি অশ্বের ওপর সওয়ার ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস তাঁর অশ্বের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাফেররা সরাসরি তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে তিনি অশ্ব থেকে নেমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তখন শত্রুপক্ষের এমন কেউ ছিল না, যার চোখে সে ধূলিকণা প্রবেশ করেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এই কবিতা আবৃত্তি করে ছিলেন—

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.

আমি নবী—এতে কোনো মিথ্যা নেই। আমি বীর আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক দুঃসাহসী, বীর ও নির্ভীক কাউকে দেখা যায়নি।*–মাদারেজুন্নবুওয়াত*

হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা না কোনো বীর, সবল ও উদারপ্রাণ ব্যক্তি দেখেছি এবং না অন্যান্য চরিত্রগুণেও তাঁর চেয়ে পছন্দনীয় কাউকে দেখেছি। বদর যুদ্ধে আমরা তাঁর আড়ালে আশ্রয় নিতাম। কারণ, বড় বীর তাকেই মনে করা হতো, যে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সন্নিকটে থাকত। কারণ, তখন তিনিই ছিলেন কাফেরদের নিকটবর্তী।*–নাশরুত তীব*

অল্পে তুষ্টি ও তাওয়াক্কুল

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী দিনের জন্য কোনো বস্তু সঞ্চয় করে রাখতেন না।–*শামায়েলে তিরমিযী*

অর্থাৎ, যা আসত নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। আগামীকাল আবার প্রয়োজন হবে—এ ধারণায় সংরক্ষিত রাখতেন না; এটা ছিল তাঁর চরম তাওয়াক্কুল। যে প্রভু আজ দিয়েছেন, তিনি কালও দেবেন—এই ছিল তাঁর মনোভঙ্গি। তবে এ নিয়ম কেবল তাঁর নিজের জন্যেই ছিল; নতুবা পত্নীগণের ভরণ-পোষণের উপকরণ অধিকাংশ সময় একসাথে তাদের হাতে সমর্পণ করে দিতেন। তারা যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যয় করতে পারতেন, বণ্টনও করে দিতে পারতেন; কিন্তু তারাও তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই পত্নী ছিলেন—হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার খেদমতে একবার এক লাখ দেরহামেরও বেশি নজরানা পেশ করা হয়। তিনি একটি বড় থালা আনিয়ে তা ভরে ভরে সেগুলো বণ্টন করে দিলেন। সেদিন তিনি রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় একটি রুটি ও যয়তুনের তৈল দ্বারা ইফতার করলেন। বাঁদি আরজ করল, এক দিরহামের গোশত কিনে আনলে আজ তাতে ইফতার করা যেত। তিনি বললেন, এখন বললে কী হবে, সে সময় মনে করিয়ে দিলে না কেন?–*খাসায়েলে নববী*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এটা পছন্দ করি না যে, ওহুদ পাহাড় আমার জন্যে স্বর্ণে পরিণত হবে, আর রাত্রিবেলায় আমার কাছে তার এক দিনারও অবশিষ্ট থাকবে, সেই দিনার ছাড়া, যা আমি ঋণ পরিশোধের জন্যে রেখে দেব।

এটা তাঁর চূড়ান্ত দানশীলতার প্রমাণ। এ কারণে অনেক সময় তিনি ঋণভারে ভারাক্রান্ত থাকতেন। এমনকি তাঁর ওফাতের সময় তাঁর লৌহবর্মখানাও পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার বহনের দায়ে বন্ধক রাখা ছিল।–*নাশরুত তীব*

স্বভাবগত বিনয়

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবগতভাবে কঠোরভাষী ছিলেন না, এমনকি প্রয়োজনেও কঠোরভাষী হতেন না। তিনি বাজারে গিয়েও গাম্ভীর্যের পরিপন্থী কথাবার্তা বলতেন না এবং মন্দের জবাবে মন্দ কাজ করতেন না, বরং ক্ষমা করে দিতেন। লজ্জার আতিশয্যে তাঁর দৃষ্টি কারও মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ হয়ে থাকত না। যদি কোনো প্রয়োজনে কোনো অশোভন বিষয় উল্লেখ করতেই হতো, তবে ইশারা-ইঙ্গিতে উল্লেখ করতেন।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনের দিক দিয়ে সর্বাধিক প্রশস্ত ছিলেন। সত্য কথা বলতেন এবং নরম স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন। তিনি সামাজিকতায় অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন। কেউ দাওয়াত করলে তিনি কবুল করতেন। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করতেন—যদিও (সেই হাদিয়া অথবা দাওয়াতের খাদ্য) গরু অথবা ছাগলের পায়ের মতো তুচ্ছ কোনো বস্তুও হতো। তিনি হাদিয়ার প্রতিদানও দিতেন। তিনি ক্রীতদাস, আজাদ, বাঁদি, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের দাওয়াতই কবুল করতেন। মদীনার জনপদের শেষ প্রান্তেও যদি কেউ রুগ্‌ণ হতো, তিনি তাকে দেখতে যেতেন। কেউ ওজরখাহি করলে তিনি তার ওজর কবুল করতেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে অগ্রণী হয়ে মুসাফাহা বা করমর্দন করতেন। তাঁকে কখনো সাহাবীগণের মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখা যায়নি। কেউ তাঁর কাছে এলে তিনি তার সমাদর করতেন এবং কোনো কোনো সময় তার বসার জন্যে নিজের গায়ের চাদর পর্যন্ত বিছিয়ে দিতেন। তিনি কারও কথা কেটে কিছু বলতেন না। স্মিত হাসিতে ও প্রফুল্লতায় তিনি সবার অগ্রণী ছিলেন। তবে ওহী অবতরণের সময় অথবা ওয়াজ ও খুতবা দানকালে তাঁর মুখে হাসি কিংবা কৌতুক প্রকাশ পেত না।–*নাশরুত তীব*

সততা ও বিশ্বস্ততা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সত্যের প্রতি দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখনই সমগ্র জাতি তাঁর শত্রু হয়ে যায়। তারা তাঁকে

নির্যাতন করতে কোনো ত্রুটি অবশিষ্ট রাখেনি; কিন্তু তখনও কোনো মুশরিক তাঁর সাধুতা ও বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করেনি; বরং মুশরিকরা পর্যন্ত তাদের টাকা-পয়সা, গহনা ইত্যাদি এনে তাঁর কাছেই গচ্ছিত রাখত। তারা মক্কায় অন্য কাউকে তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত বলে মনে করত না। হিজরতের সময় তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কায় রেখে যান, যাতে লোকদের গচ্ছিত দ্রব্যাদি তাদেরকে ফেরত দিয়ে মদীনায় আসতে পারেন।–*মাদারিজুন নবুওয়াত*

নম্রতা

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে মুসলমানগণ, তোমরা আমার সীমাতিরিক্ত প্রশংসা কোরো না, যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালামের বেলায় করেছে। কেননা, আমি আল্লাহর বান্দা। অতএব, তোমরা আমার সম্পর্কে এতটুকুই বলতে পারো যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।–*মাদারিজুন নবুওয়াত, যাদুল মাআদ*

হযরত আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছড়িতে ভর দিয়ে আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি বললেন, অনারবরা যেমন একে অন্যের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়, তোমরা তেমন কোরো না। তিনি আরও বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা। বান্দারা যেমন খায়, আমি তেমনি খাই। বান্দারা যেভাবে বসে, আমিও তেমনিভাবে বসি। বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা বলা ছিল তাঁর গাম্ভীর্য ও নম্র স্বভাবের কারণে।–*মাদারিজুন নবুওয়াত*

হাদীসে আছে, একবার এক সফরে কয়েকজন সাহাবী একটি ছাগল জবেহ করার আয়োজন করে তারা সমস্ত কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন। কেউ জবেহ করার, কেউ চামড়া ছাড়ানোর এবং কেউ রান্না করার দায়িত্ব নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রান্না করার জন্যে লাকড়ি সংগ্রহ করা আমার কাজ। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হুযুর, এ কাজ আমরাই করে নেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা তো আমিও বুঝি যে, তোমরা সানন্দে এ কাজ করে নেবে; কিন্তু আমি সকলের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে থাকা পছন্দ করি না এবং আল্লাহ তাআলাও এটা পছন্দ করেন না।–*খাসায়েলে নববী*

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাজারে এলে তিনি চার দিরহাম দিয়ে একটি পায়জামা খরিদ করলেন। অতঃপর তিনি ওজনকারীকে বললেন, মূল্য বাবদ প্রদত্ত মালগুলো খুব টেনে টেনে ওজন করো (অর্থাৎ, ওজনে কম অথবা সমান সমান নিয়ো না; বরং কিছু বেশি নাও)। ওজনকারী বিস্মিত হয়ে বলল, আমি কখনো কাউকে মূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে এমন কথা বলতে শুনিনি। হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, পরিতাপের বিষয় যে, তুমি তোমার নবীকেও চেনো না। এ কথা শুনে লোকটি দাঁড়িপাল্লা ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে চুমো খেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত টেনে বললেন, এটা অনারবদের নিয়ম। তারা তাদের রাজা ও প্রধানদের হস্ত চুম্বন করে । আমি রাজা নই, আমি তো তোমাদেরই একজন (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী এ কথা নম্রতাবশত বলেছেন)। অতঃপর তিনি পায়জামাটি তুলে নিলেন। হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত থেকে পায়জামাটি নিতে চাইলে তিনি বললেন, জিনিস তুলে নেওয়ার অধিকার জিনিসের মালিকেরই রয়েছে। তবে যে দুর্বল এবং বইতে অক্ষম, তাকে সাহায্য করা তার অন্য ভাইয়ের কর্তব্য।–*মাদারিজুন নবুওয়াত*

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পুরনো পালানে বসে হজ করেন, যার ওপর একটি কাপড় ছড়ানো ছিল, যার মূল্য চার দিরহামও ছিল না। এরপরেও তিনি দুআ করছিলেন, হে আল্লাহ, এ হজকে লোক দেখানো নয়, এমন কিংবা আড়ম্বরহীন হজে পরিণত করুন।–*শামায়েলে তিরমিযী*

মক্কা বিজয়ের দিন যখন তিনি বিরাট মুসলিমবাহিনী সাথে নিয়ে বিজয়ীবেশে শহরে প্রবেশ করেন, তখন আল্লাহর দরবারে বিনয় ও নম্রতা

বশত মস্তক বাহনের পালানের ওপর ঝুঁকিয়ে দেন; এমনকি, গদির সামনের লাকড়ির সাথে তাঁর মস্তক লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়।–*শিফা*

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, সাহাবয়ে কেরামের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোনো ব্যক্তি দুনিয়াতে ছিল না, এতদসত্ত্বেও তারা অনেক সময় তাঁকে দেখে দাঁড়াতেন না। কারণ, তিনি এটা পছন্দ করতেন না।–*শামায়েলে তিরমিযী*

একবার আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর কয়েকজন দূত আগমন করলে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সমাদরের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এদের সেবা-যত্নের সুযোগ আমাদেরকে দান করুন। তিনি বললেন, তারা আমার সাহাবীগণের অপরিসীম খেদমত ও সম্মান করেছেন। এখন তাদের সেই মহত্ত্বের কিছুটা প্রতিদান আমাকেও দিতে দাও।–*মাদারিজুন নবুওয়াত*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সহনশীল ছিলেন; কখনো কাউকে গালি দিতেন না, কঠোর কথা বলতেন না, অভিসম্পাত করতেন না এবং বদদোয়াও দিতেন না।

তিনি কাফের ও শত্রুর সাথেও মন জয় করার আশায় হাসিমুখে ব্যবহার করতেন এবং বাহ্যিক ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা শুনেও সবর করতেন। ঘরে ফিরে গৃহস্থালি কাজ-কর্মের ব্যবস্থা করতেন। তিনি চাদর পরিধানে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন, যাতে হাত-পা খোলা না থাকে (সম্ভবত উপবিষ্ট অবস্থায় এরূপ হয়ে থাকবে)। তাঁর হাসিমুখ ও ইনসাফ সকলের জন্যে ব্যাপক ছিল এবং ক্রোধ তাঁকে কখনো নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণহারা করতে পারত না।

নিজের সঙ্গীদের ব্যাপারে কোনো বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন না। তাঁর মধ্যে দৃষ্টির খেয়ানত তথা অপব্যবহার ছিল না। অন্তরের খেয়ানতের তো কথাই নেই।–*নাশরুত তীব*

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মন্দ অভ্যাসসমূহের মধ্যে মিথ্যা খুবই অসহনীয় ছিল।–*বায়হাকী, ইবনে সাদ*

অনাবিল অন্তর

ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জোর দিয়ে বললেন, আমার সাহাবীগণের মধ্যে কেউ যেন কারও কোনো দোষ-ত্রুটি আমার কাছে না পৌঁছায়। কেননা, আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, যখন আমি তোমাদের মধ্যে আসি, তখন যেন সকলের প্রতি আমার অন্তর অমলিন থাকে।–*আবু দাউদ, তরজুমানুস সুন্নাহ, শিফা*

স্নেহ-মমতা

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সদাচারী ছিলেন। একদিন তিনি আমাকে কোনো কাজে পাঠালেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি যাব না। কিন্তু আমার মনে ছিল, আমি অবশ্যই যাব। অতঃপর আমি বের হলাম এবং বাজারে খেলাধুলায় মত্ত কতিপয় বালকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সাথে খেলায় লেগে গেলাম। ইতোমধ্যে হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছন দিক থেকে এসে আমার মাথার চুল ধরে ফেললেন। আমি পিছন দিক ফিরে দেখি তিনি এসেছেন। অতঃপর বললেন, আনাস, তোমাকে যেখানে পাঠিয়েছিলাম, সেখানে গিয়েছিলে তো? আমি বললাম, হ্যাঁ, যাব, ইয়া রাসূলাল্লাহ।–*মেশকাত*

হযরত আনাস বলেন, আমি আট বছর বয়স থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি এবং দীর্ঘ দশটি বছর এ দায়িত্ব পালন করেছি। এ সময়ের মধ্যে আমার কোনো কাজের জন্যে তিনি আমাকে তিরস্কার করেননি। পরিবারের অন্য কেউ তিরস্কার করলে তিনি বলেছেন, একে ছাড়ো, বিধিলিপিতে যা আছে, তা ঘটেই থাকে।–*মেশকাত*

ত্যাগ ও ধৈর্য

এক রেওয়ায়েতে আছে, যায়দ ইবনে শানা পূর্বে ইহুদি ছিলেন। তিনি একবার বলতে লাগলেন, নুবওয়াতের আলামতসমূহের মধ্যে সকল

আলামতই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম; কিন্তু মাত্র দু'টি আলামতের পরীক্ষা বাকি ছিল—

এক. তাঁর সহিষ্ণুতা তাঁর ক্রোধের ওপর প্রবল হবে।

দুই. তাঁর সাথে যতই মূর্খজনোচিত ব্যবহার করা হবে, ততই সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাবে।

আমি দু'টি আলামত পরীক্ষা করার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম এবং তাঁর কাছে একটু বেশি পরিমাণে আসা-যাওয়া করতে লাগলাম। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ঘর থেকে বাইরে এলেন। তাঁর সাথে ছিলেন হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু। ইতোমধ্যে জনৈক বেদুইনের মতো ব্যক্তি এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, মুসলমান হয়ে গেলে তোমাদের আর রিজিকের কোনো অভাব থাকবে না, কিন্তু এখন তারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত। আমার ভয় হচ্ছে, এ অবস্থায় তারা ইসলাম ছেড়ে না যায়। যদি ভালো মনে করেন, তবে আপনি তাদেরকে কিছু সাহায্য করুন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবত হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দিকে দেখলেন। তিনি আরজ করলেন, হুযুর, কিছুই তো মজুদ নেই। আমি (অর্থাৎ, যায়েদ, তিনি তখন পর্যন্ত ইহুদি ছিলেন এবং এই দৃশ্য অবলোকন করছিলেন) বললাম, মুহাম্মদ, যদি আপনি অমুক ব্যক্তির বাগানের এই পরিমাণ খেজুর নির্দিষ্ট মেয়াদের ওপর আমাকে দেন, তবে আমি অগ্রিম মূল্য দিয়ে দেব এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে খেজুর নিয়ে নেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা হতে পারে না। তবে যদি বাগান নির্দিষ্ট না কর, তবে আমি এ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারি। আমি তার প্রস্তাব মেনে নিলাম এবং খেজুরের মূল্য আশি মিসকাল (এক মিসকাল সাড়ে চার মাশার সমান) দিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্বর্ণ উক্ত বেদুইন ব্যক্তির হাতে দিয়ে বললেন, ইনসাফের প্রতি লক্ষ রেখে এ দ্বারা তাদের অভাব দূর করে দাও।

যায়েদ বলেন, খেজুর পরিশোধ করার সময় আসতে তখনও কয়েক দিন বাকি ছিল। এ সময় একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,

আবু বকর, ওমর ও ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ একদল সাহাবীর সাথে একটি জানাযার নামাযে শরিক হতে গেলেন। নামায শেষে তারা একটি প্রাচীরের কাছে বসেছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর কোর্তা ও চাদরের কিনারা ধরে অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় বললাম, হে মুহাম্মদ, আপনি আমার ঋণ পরিশোধ করছেন না কেন? আল্লাহর কসম, আবদুল মুত্তালিবের বংশধরকে আমি ভালোরূপেই চিনি। তারা কিছু নিলে আর তা ফেরত দিতে চায় না।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে আমার দিকে দেখলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর দুশমন, এ কী বকছিস! আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয় না থাকলে আমি এই মুহূর্তে তোর গর্দান উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত শান্ত মনে আমাকে দেখছিলেন। অতঃপর সহাস্যে বললেন, ওমর, আমি আর সে তোমার কাছে আরও একটি বিষয়ের মুখাপেক্ষী ছিলাম। তা এই যে, তুমি আমাকে সুন্দরভাবে প্রাপ্য পরিশোধ করতে বলতে আর তাকে উত্তম পন্থায় তাগাদা করার উপদেশ দিতে! যাও, তাকে নিয়ে যাও এবং তার প্রাপ্য পরিশোধ করে দাও। আর তুমি যে তাকে শাসিয়েছ, এর বিনিময়ে তাকে বিশ ছা'অ (প্রায় দু'মণ) খেজুর বেশি দিয়ে দাও।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে নিয়ে গেলেন এবং আমার পূর্ণ দাবি মিটিয়েও বিশ ছা'অ খেজুর বেশি দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই বিশ ছা'অ কেন? তিনি বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই আদেশ করেছেন। আমি বললাম, ওমর, আপনি আমাকে চেনেন কি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, আমি যায়েদ ইবনে শানা। তিনি বললেন, সেই ইহুদিদের বড় পণ্ডিত? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমিই ইহুদিদের বড় পণ্ডিত। তিনি বললেন, এত বড় সম্মানিত লোক হয়েও তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এমন নিকৃষ্ট ব্যবহার করলে কেন? আমি বললাম, নবুওয়াতের আলামতসমূহের মধ্যে দু'টি আলামত পরীক্ষা করার সুযোগ আমি ইতোপূর্বে পাইনি। একটি এই যে, তাঁর সহিষ্ণুতা তাঁর

ক্রোধের ওপর প্রবল হবে। দ্বিতীয় এই যে, তাঁর সাথে যতই মূর্খজনোচিত ব্যবহার করা হবে, তাঁর সহিষ্ণুতা ততই বৃদ্ধি পাবে। এখন এ দু'টি আলামতও পরীক্ষা করে দেখলাম। এখন আমি আপনাকে আমার ইসলাম গ্রহণের সাক্ষী করছি। আমার অর্ধেক মাল উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে সদকা। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম। যায়েদ ইবনে শানা এরপর বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অবশেষে তাবুক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।–*জমউল ফাওয়ায়েদ, খাসায়েলে নববী*

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাচনিক রেওয়ায়েত করেন যে, একবার হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধে শক্ত পাড়বিশিষ্ট একটি নাজরানি চাদর ছিল। এ সময় এক বেদুইন এসে তাঁর চাদর ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের দিকে চেয়ে দেখি, চাদরের শক্ত প্রান্তের টানে তাঁর কাঁধ ছিলে গেছে। এরপর বেদুইন বলল, মুহাম্মদ, আপনার কাছে রক্ষিত আল্লাহ তাআলার মাল থেকে আমাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিন। এমতাবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেওয়ার জন্য আমাকে বললেন।–*মাদারিজুন নবুওয়াত*

একবার মক্কায় এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যে, লোকেরা হাড্ডি ও মৃত জন্তু খেতে শুরু করে দেয়। আবু সুফিয়ান তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর শত্রু ছিল। সে এসে বলল, মুহাম্মদ, আপনি মানুষকে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা দেন। আপনার সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারাচ্ছে। আপনি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য দুআ করছেন না কেন? কুরাইশদের নির্যাতন ও অনিষ্টকারিতা যদিও সকল সীমা-পরিসীমা অতিক্রম করেছিল, কিন্তু আবু সুফিয়ানের কথা শুনে তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআর হাত উত্তোলন করলেন।

দুআর ফলে আল্লাহ তাআলা এত বৃষ্টি বর্ষণ করলেন যে, চারদিকে কেবল পানিই পানি দেখা যেতে লাগল এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল।–*বুখারী* : তাফসীর—সূরা দুখান

সংসার-নির্লিপ্ততা ও সংযমশীলতা

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন, হে আল্লাহ, আমাকে মিসকিন অবস্থায় জীবিত রাখুন, মিসকিন অবস্থায় দুনিয়া থেকে তুলে নিন এবং মিসকিনদের দলে আমার হাশর করুন।–*জামে তিরমিযী*, *বায়হাকী*, *ইবনে মাজাহ*

জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে লোকেরা একবার ধনাঢ্যতা ও পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন (অর্থাৎ, পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য ভালো না মন্দ, পরকালের জন্যে ক্ষতিকর, না উপকারী?)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে (এবং তাঁর বিধানাবলি পালন করে), তার ধনাঢ্য হওয়ায় কোনো দোষ নেই। তবে খোদাভীরুর জন্যে সুস্বাস্থ্য ধনাঢ্যতা অপেক্ষাও উত্তম। মনের প্রফুল্লতাও আল্লাহ তাআলার একটি নেয়ামত (এর জন্যে শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব)।–*মুসনাদে আহমদ*

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একবার হযরত উরওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ভাগ্নে, আমরা (নবী-পরিবারের লোকজন এভাবে জীবন যাপন করতাম,) কখনো কখনো উপর্যুপরি তিন-তিনটি চাঁদ দেখে নিতাম (অর্থাৎ পূর্ণ দু'মাস অতিবাহিত হয়ে যেত), অথচ আমাদের ঘরে চুলো গরম হতো না। (উরওয়া বলেন) আমি বললাম, তা হলে আপনারা বেঁচে থাকতেন কেমন করে? হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা জবাব দিলেন, শুধু খেজুরের দানা ও পানিই আমাদের খাবার ছিল। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন আনসারী প্রতিবেশীর কিছু সংখ্যক দুধের জন্তু ছিল। তারা তাঁর জন্যে হাদিয়াস্বরূপ দুধ পাঠাতেন। তা থেকে আমরাও পেতাম।– *বুখারী*, *মুসলিম*

আল্লাহর ভয়

আব্দুল্লাহ ইবনে সখর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই চিন্তামগ্ন থাকতেন। কোনো সময়ই তাঁর স্বস্তি ছিল না (এটা ছিল পরকাল চিন্তার কারণে)। তিনি সারাদিনে সত্তর অথবা একশোবার এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন। আমি বলি, এটা উম্মতের শিক্ষার জন্যে ছিল অথবা তিনি নৈকট্য ও আধ্যাত্মিকতার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকতেন এবং প্রতি মুহূর্তে তাতে উন্নতি লাভ করতেন।–*নাশরুত তীব*

অন্তরের কোমলতা

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক দৌহিত্রী মরণোন্মুখ ছিল। তিনি তাকে কোলে তুলে সামনে রেখে দেন—এমতাবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়ে যায়। বাঁদি উম্মে আয়মান সজোরে কান্না শুরু করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর নবীর সামনেই কাঁদতে শুরু করলে? (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ দিয়েও তখন অশ্রু ঝরছিল। তাই) বাঁদি আরজ করল, আপনিও তো কাঁদছেন। তিনি বললেন, এরূপ কান্না নিষিদ্ধ নয়, এটা আল্লাহর রহমত (কারণ, এতে বান্দার মন নরম হয় এবং তাতে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি হয়)। অতঃপর তিনি বললেন, মুমিন সর্বাবস্থায় কল্যাণের মধ্যেই থাকে। এমনকি, যখন তার আত্মা বের করা হয় তখনও সে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতে থাকে।–*শামায়েলে তিরমিযী*

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসমান ইবনে মাযউনের ওফাতের পর তার কপাল চুম্বন করেন। তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।–*শামায়েল*

আব্দুল্লাহ ইবনে সখর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যখন উপস্থিত হই, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। কান্নার কারণে তাঁর বুকের ভেতর থেকে ডেকচির স্ফুরণের মতো আওয়াজ বেরোচ্ছিল।–*শামায়েল*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কুরআন পাঠ করে শোনাতে বললেন। আমি আরজ করলাম, হুযুর, কুরআন তো আপনার প্রতিই নাযিল হয়েছে, আবার আপনাকেই শোনাব—এ কেমন কথা? তিনি বললেন, অন্যের মুখে শুনতে আমার মন চায়। আমি নির্দেশ মোতাবেক সূরা নিসা তেলাওয়াত করতে শুরু করলাম, যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.

তখন কী হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের সম্পর্কে সাক্ষীরূপে হাজির করব?–সূরা নিসা (৪) : ৪১

এ আয়াত পাঠ করে আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার দিকে তাকালাম। দেখলাম, তাঁর চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে।–*শামায়েল*

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুমের কবরের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।–*শামায়েল*

করুণা ও দয়ার্দ্রতা

একবার জনৈক সাহাবী পাখির বাচ্চা হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হন। বাচ্চাগুলো তখন চিঁ চিঁ করছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ বাচ্চা কীসের? সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এক ঝোপের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় এগুলোর আওয়াজ শুনতে পাই। তাই এগুলোকে বের করে নিয়ে এসেছি। এদের মা এ দৃশ্য দেখে অস্থির হয়ে আমার মাথার ওপর চক্কর দিতে শুরু করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক্ষুনি যাও এবং যেখান থেকে বাচ্চাগুলো এনেছ, সেখানে রেখে এসো।–*আবু দাউদ*

একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারীর বাগানে গেলেন। সেখানে একটি উট ক্ষুধায় চেঁচামেচি করছিল। তখনি তার পিঠের ওপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং মালিককে ডেকে বললেন, এ জন্তুটির ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না?–*আবু দাউদ*

একবার হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গোলামকে প্রহার করছিলেন। ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আগমন করলেন। তিনি দুঃখিত হয়ে বললেন, আবু মাসউদ, এ গোলামের ওপর তোমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, তোমার ওপর আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা তার চাইতে অনেক বেশি।

হযরত আবু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ কথা শুনে কেঁপে উঠলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এ গোলামকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এরূপ না করলে দোজখের আগুন তোমাকে স্পর্শ করত।–*আবু দাউদ*

আল্লাহর দাসত্ব

হযরত ফযল রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তিনি জ্বরাক্রান্ত হয়েছেন এবং মাথায় পট্টি বেঁধে রেখেছেন। তিনি বললেন, ফযল, আমার হাত ধরো। আমি তাঁর হাত ধরলে তিনি মসজিদে চলে গেলেন এবং মিম্বরের ওপর বসে বললেন, লোকজনকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি লোকজনকে সমবেত করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন, তোমাদের কাছ থেকে আমার চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তাই যার কোমরে আমি আঘাত করেছি, আমার কোমর উপস্থিত আছে, সে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। যদি কারও ইজ্জত আমি নষ্ট করে থাকি, তবে সে আমার ইজ্জতের ওপর হামলা করে তার বদলা নিক। আমার ওপর কারও অর্থ-কড়ির দাবি থাকলে সে আমার অর্থ থেকে দাবি পূরণ করুক। কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, আমার

কাছ থেকে বদলা নিলে আমার মনে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। শত্রুতা রাখা আমার স্বভাব নয় এবং এটা আমার জন্যে শোভনীয়ও নয়। মনে রেখো, আমার কাছে সে ব্যক্তিই অধিক প্রিয়, যে তার প্রাপ্য আমার কাছ থেকে আদায় করে নেয় অথবা আমাকে ক্ষমা করে দেয়। কেননা, আমি হৃষ্টচিত্তে আল্লাহর কাছে যেতে চাই। আমি এই ঘোষণা একবার বলেই ক্ষান্ত হতে চাই না। আবারও ঘোষণা করব। অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন এবং যোহরের নামায শেষে পুনরায় মিম্বরে বসলেন, তিনি আবার সে ঘোষণা করলেন এবং শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারেও উপরোক্ত বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করলেন। তিনি আরও বললেন, যার জিম্মায় কোনো প্রাপ্য আছে, সে তা পরিশোধ করুক এবং সে যেন দুনিয়ার লাঞ্ছনার কথা চিন্তা না করে। কেননা, দুনিয়ার লাঞ্ছনা পরকালের লাঞ্ছনা অপেক্ষা খুবই সামান্য।

এ বক্তব্য শোনার পর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করল, আপনার কাছে আমার তিন দিরহাম পাওনা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কোনো দাবিদারকে মিথ্যাবাদী বলি না এবং তাকে কসমও দিই না; কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এই তিন দিরহাম কীসের? লোকটি আরজ করল, একদিন জনৈক ভিক্ষুক আপনার কাছে এসেছিল। তাকে তিন দিরহাম দেওয়ার জন্যে আপনি আমাকে আদেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, তাকে তিন দিরহাম দিয়ে দাও। এরপর আরেকজন দাঁড়িয়ে আরজ করল, আমি বায়তুল মালের তিন দিরহাম অসদুপায়ে গ্রহণ করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কেন অসদুপায় অবলম্বন করেছিলে? লোকটি বলল, আমি তখন খুবই অভাবী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযলকে বললেন, তার কাছ থেকে তিন দিরহাম নিয়ে নাও। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন, কেউ নিজের সম্পর্কে কোনো খারাপ অবস্থার আশঙ্কা করলে সেও দুআ করিয়ে নিক (কেননা, এখন রওয়ানা হয়ে যাওয়ার সময়)। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মিথ্যাবাদী, আমি মোনাফেক, আমি অতি নিদ্রার রোগী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার

জন্যে দুআ করলেন, হে আল্লাহ, তাকে সত্যবাদিতা দান করুন, পূর্ণ ঈমান দান করুন এবং অতি নিদ্রারোগ থেকে মুক্ত করুন। এরপর আরও এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মিথ্যাবাদী, আমি মোনাফেক এবং এমন কোনো গুনাহ নেই যা আমি করিনি। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে সতর্ক করে বললেন, তুমি তোমার গুনাহ প্রচার করছ কেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর, চুপ করো। দুনিয়ার লাঞ্ছনা পরকালের লাঞ্ছনা অপেক্ষা হালকা। হে আল্লাহ, একে সত্যবাদিতা ও পূর্ণ ঈমান দান করুন এবং তার অবস্থা ভালো করে দিন। অন্য এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ভীরু, নিদ্রারোগী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যেও দোয়া করলেন। ফযল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এরপর থেকে আমরা দেখতাম, এই ব্যক্তির মতো সাহসী আর কেউ ছিল না।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার ঘরে চলে গেলেন এবং মহিলাদের সমাবেশেও পূর্বোক্ত ঘোষণা করলেন। তিনি পুরুষদের সমাবেশে যা বলেছিলেন, এখানেও তার পুনরুল্লেখ করলেন।

এক মহিলা সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কথা বলতে অক্ষম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যেও দুআ করলেন।

অতঃপর তিনি ঘোষণা করলেন, কেউ নিজের সম্পর্কে কোনো খারাপ অবস্থার আশঙ্কা করলে সে দুআ করিয়ে নিক। সে মতে মহিলারা নিজেদের সম্পর্কে বিভিন্ন দুআ করিয়ে নিলেন।–*মাজমাউয যাওয়ায়িদ*

আল্লাহ তাআলার সঙ্গ

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বক্ষণ ও সর্বসময় আল্লাহ তাআলার জিকির করতেন এবং প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতেন। আল্লাহর স্মরণ থেকে কোনো কিছুই তাঁকে বিরত রাখত না। তাঁর প্রত্যেকটি কথা আল্লাহর স্মরণ, হামদ ও প্রশংসা, একত্ব ঘোষণা ও পবিত্রতা প্রকাশ এবং মাহাত্ম্যের

বর্ণনাসম্বলিত হতো। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি, অঙ্গীকার ও শাস্তি, আদেশ ও নিষেধ, বিধানাবলির শিক্ষা, বেহেশত ও দোজখের আলোচনা, উৎসাহ ও ভীতির বর্ণনা—এসবই ছিল আল্লাহর জিকির। নীরব থাকার সময়ও আল্লাহ তাআলার স্মরণ তাঁর অন্তরে জাগ্রত থাকত। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি শ্বাস, তাঁর অন্তর ও জিহ্বা, ওঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ, পানাহার, ঘ্রাণ নেওয়া, আসা-যাওয়া, সফর ও গৃহে অবস্থান, পায়ে হাঁটা ও যানবাহনে আরোহণ করা—মোটকথা, কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর জিকির থেকে বিচ্ছিন্ন থাকত না। অন্তরে ও মুখে যেভাবেই সম্ভবপর হতো সর্বাবস্থায় কেবল আল্লাহর জিকির হতো।

দিবারাত্রির কর্মকাণ্ড ও বাস্তবতায় এবং তাহাজ্জুদের সময় থেকে নিদ্রা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ পাঠ করতেন। এসব দুআয় প্রত্যেক প্রয়োজন ও মাকসুদ শামিল রয়েছে এবং প্রত্যেক মাকসুদের জন্যে আলাদা আলাদা দুআ বর্ণিত হয়েছে। *–মাদারিজুন নবুওয়াত*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারিদ্র্য

ইমাম কাস্তলানী রহ. *মাওয়াহেব* কিতাবে লিখেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ সম্পর্কে রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তারা অনেক বেলা ক্ষুধার্ত থাকতেন। খাওয়ার মতো তাদের কাছে কিছুই থাকত না। কখনো খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন এবং কখনো খেজুরও পাওয়া না গেলে কেবল পানি পান করেন কাটিয়ে নিতেন। অপরদিকে রেওয়ায়েতসমূহে এসব তথ্যও পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার-পরিজনকে সারা বছরের ভরণ-পোষণ একবারেই দিয়ে দিতেন। তিনি চল্লিশজন সাহাবীর মধ্যে চল্লিশটি উটও বিতরণ করেছেন। হজ ও ওমরার মধ্যে তিনি শত শত উট জবেহ করেছেন। তিনি কোনো এক বেদুইনকে ছাগলের পাল দান করেছেন। তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক ছিলেন। তাদের উদার দানশীলতার বহু ঘটনা রয়েছে—যেমন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, ওসমান গনী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহুম

প্রমুখ। তারা প্রায়ই তাদের ধন-সম্পদ দ্বারা মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। অতএব, যদি এমনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ধনাঢ্যতা থাকবে, তা হলে কয়েকদিন যাবৎ ক্ষুধার্ত থাকা এবং মাসের পর মাস চুলা না জ্বলার অর্থ কী? আর যদি এমনি দারিদ্র্য থাকবে যে, পানাহারের জন্যে কিছুই পেতেন না, তবে এই দান-দক্ষিণা কেমন করে হতো? এ পরস্পরবিরোধী চিত্রটি সাধারণ মানুষের চিন্তাধারায় স্বভাবতই তালগোল পাকিয়ে দেয়।

ইমাম তাবারী রহ.-এর বর্ণনা এবং *ফাতহুল বারীতে* এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের এ কষ্টভোগ বাস্তবে দারিদ্র্য কিংবা অপারগতার কারণে ছিল না। এমন সাহাবীর সংখ্যা কমই ছিল, যাঁরা বাস্তবিকই নিঃস্বতা ও দরিদ্রতার জীবন যাপন করতেন। আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের ক্ষুধার্ত থাকা কদাচিৎ অক্ষমতার কারণে হয়েছে। সাধারণভাবে তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট স্বেচ্ছায় বরণ করতেন, যাতে অপরের জন্যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং পার্থিব ধন-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও সত্যের সমর্থন থেকে গাফেল করে দেয়।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, সত্য কথা হলো এই, অধিকাংশ সাহাবী যত দিন মক্কায় ছিলেন, তত দিন নিঃস্বই ছিলেন। মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে যাওয়ার পর আনসাররা সর্বতোভাবে তাদের সহযোগিতা করেন। তারা তাদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দেন এবং কাজ-কারবারে অংশীদার করে নেন। এরপর জিহাদের সূচনা হয়। বিভিন্ন এলাকা বিজিত হয় এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আসতে শুরু করে। এতে প্রায় সমস্ত সাহাবীই সমৃদ্ধ হয়ে যান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম অর্জিত ধন-দৌলত ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের জন্যে ব্যয় করতেন না। তাদের সকল অর্থ-সম্পদ সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণ ও মঙ্গলে ব্যয়িত হতো।

আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার আল্লাহ আমাকে বলেছেন, হে নবী, আপনি ইচ্ছা

করলে সমগ্র মক্কা উপত্যকা আপনার জন্যে স্বর্ণে পরিণত করে দেওয়া হবে। আমি আরজ করলাম, পরওয়ারদেগার, আমি বরং একদিন উপবাস করা এবং একদিন পেটভরে আহার করা পছন্দ করি যেন উপবাসের দিন আপনার দরবারে কান্নাকাটি ও একান্তভাবে আপনারই স্মরণে মশগুল থাকতে পারি। পক্ষান্তরে যেদিন পেটভরে খাই, সেদিন অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনার শোকরগুজারি ও প্রশংসা করি।–*ফতহুল বারী, মাদারিজুন নবুওয়াত*

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও দারিদ্র্য ও উপবাসের কঠোরতা ভোগ করেছেন। আল্লাহ তাআলার অনুকম্পাসমূহের মধ্যে এ অনুকম্পাটি আমিও সর্বাধিক পছন্দ করি।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তৃপ্ত হয়ে খাদ্য গ্রহণ করতেন না এবং তিনি কখনো কারও কাছে এ সম্পর্কে মুখও খোলেননি। কেননা, তিনি দারিদ্র্যকে ধনাঢ্যতা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করতেন। তিনি প্রায়ই ক্ষুধার কারণে সারারাত্রি অস্থির থাকতেন, কিন্তু এই ক্ষুধা তাঁকে পরবর্তী দিন রোযা রাখা থেকে বিরত রাখতে পারত না। রাত্রিতে কোনো কিছু পানাহার না করেই তিনি রোযা রাখতেন। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাআলার কাছে পৃথিবীর সমগ্র ধন-ভাণ্ডার, সর্বপ্রকার নেয়ামত ও প্রাচুর্য প্রার্থনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি দারিদ্র্য ও উপবাসকে বিলাস-ব্যসনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ অবস্থা দেখে কান্না জুড়ে দিতাম। ক্ষুধার কারণে স্বয়ং আমার অবস্থাও শোচনীয় হতো এবং আমি পেটে হাত বুলাতাম আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতাম, হায়, আমাদের যদি জীবন ধারণোপযোগী পানাহার সামগ্রী থাকত। স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা না হোক, কমপক্ষে সুখে জীবন যাপনের যদি সুযোগ হতো! আমার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, হে আয়েশা, দুনিয়া দিয়ে আমরা কী করব? আমার পূর্বে আমার অনেক মহান পয়গম্বর ভাই

অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা দুনিয়াতে এসে আমার চেয়ে অধিক কঠোরতা বরদাশত করেছেন, কিন্তু তাঁরা সবর করেছেন এবং সবরের অবস্থায়ই আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছেন। সেখানে তাঁদেরকে সুউচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে এবং নানা রকম নেয়ামত তাঁদেরকে দান করা হয়েছে। আমার আশঙ্কা, আমাকে এ দুনিয়ায় স্বাচ্ছন্দ্য দান করা হলে আখেরাতের অক্ষয় নেয়ামত হ্রাস পাবে। আমার কাছে এরচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় কোনো কিছু পাওয়ার নেই যে, আমি পরকালে আমার বন্ধু ও ভাইদের সাথে এ দরিদ্রাবস্থায় মিলিত হই।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত কথাগুলো আমাকে বলেছিলেন, সেদিনের পর একমাসও তিনি আমাদের মাঝে থাকেননি; তিনি পরম প্রভু আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে চলে যান। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। –*শিফা; মাদারিজুন নবুওয়াত; শামায়েলুর রাসূল*

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীদের খবর নিতে যেতেন, জানাযায় শরিক হতেন, গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে যেতেন এবং গোলামদের দাওয়াতও কবুল করতেন।–*শামায়েলে তিরমিযী*

তিনি স্বহস্তে ছাগলের দুধ দোহন করতেন। নিজেই নিজের কাপড় তালি লাগাতেন। নিজের পাদুকা (প্রয়োজনে) সেলাই করে নিতেন এবং নিজের ও পরিবারের কাজ করতেন।–*ইবনে সাদ*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেমদের সাথে বসে খাবার খেতেন। নিজের সওদা বাজার থেকে নিজেই বয়ে আনতেন। তিনি সর্বাধিক অনুগ্রহশীল, ন্যায়পরায়ণ, সাধু ও সত্যবাদী ছিলেন। –*মাদারিজুন নবুওয়াত*

অনন্য বৈশিষ্ট্য

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শেষে মুসল্লিদের প্রতি লক্ষ করে বলতেন, কোনো রোগী আছে কি, যাকে দেখার

জন্য যাব? কোনো জানাযা আছে কি, যার নামায পড়ব? অতঃপর প্রয়োজন হলে তিনি এসব কাজের জন্যে যেতেন।

তিনি মাটিতে বসতেন এবং মাটিতে বসেই খাদ্য গ্রহণ করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি মাটিতে শুয়েই আরাম করতেন। দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের দেখার জন্যে তাশরিফ নিয়ে যেতেন এবং নিজে তাদের কাজকর্ম করে দিতেন। তিনি কাউকে হেয় মনে করতেন না। তিনি সবসময় গরিবদের জানাযায় শরিক হতেন। দুর্বল, উপবাসক্লিষ্ট ও নিঃস্ব লোকদের কাছে নিজে গিয়ে তাদের সাহায্য করতেন। তিনি দরিদ্রতম ব্যক্তিরও দাওয়াত কবুল করতেন, মেহমানদের সমাদর করতেন এবং সৎকর্মে সহযোগিতা করতেন।

সাহাবীগণের মধ্যে কাউকে কোথাও প্রশাসক নিযুক্ত করলে তিনি তাঁকে এ ধরনের উপদেশ দিতেন, 'মানুষকে ভালো কথা বলবে, তাদের জন্যে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করবে, আল্লাহর দীনকে আকর্ষণীয় করে মানুষের সামনে পেশ করবে এবং বিবেচনাহীন আদেশ-নিষেধ জারি করে তাদেরকে বিপদে ফেলবে না' ইত্যাদি।

তিনি জ্ঞানী, গুণী ও চরিত্রবানদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং পদমর্যাদাশীলদের প্রতি অনুকম্পা করতেন। আত্মীয়-স্বজনের সম্মান করতেন এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন। আত্মীয়দের মধ্যে কে উত্তম, কে অধম, তা দেখতেন না। যাকে অধিক যোগ্য মনে করতেন, তাকে অধিক সাহায্য করতেন। সাহাবীদের সাথে দেখা হলে প্রথমে নিজে সালাম করতেন এবং সানন্দে মোসাফাহা করতেন।

জিহাদের আদেশ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নিজে জিহাদের জন্যে তৈরি হতেন। তুমুল যুদ্ধের সময় তিনি সবার সামনে এবং শত্রুর অধিকতর নিকটবর্তী থাকতেন।–*ওসায়েলুল ওসুল ইলা শামায়েলির রাসূল*

সহনশীলতা ও ক্ষমা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের নির্যাতনের মুখে সর্বাধিক সবরকারী এবং সবচেয়ে অধিক সহনশীল ছিলেন। তিনি অন্যায়কারীদের ক্ষমা করতেন এবং দুর্ব্যবহারকারীর সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। যে ব্যক্তি তাঁকে কিছুই দিত না, তিনি তাকে দিতেন। যে তাঁর প্রতি জুলুম করত, তিনি তাকে মার্জনা করতেন। প্রত্যেক কাজের দু'টি দিকের মধ্যে থেকে তিনি সহজ দিকটি অবলম্বন করতেন, যদি তা গুনাহের কাজ না হতো। এতে তিনি অনুসারীদের জন্যে সহজ দিকটির প্রতি লক্ষ রেখেছেন। এ ছাড়া অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যারা সহজ দিক পছন্দ করে, তারা অন্যের জন্যে সহজ দিক প্রস্তাব করে।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে কখনো কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেননি। তিনি কখনো কোনো মানুষ অথবা জন্তুকে স্বহস্তে প্রহার করেননি। আল্লাহর পথে জিহাদের কথা আলাদা।–*শামায়েল*

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ ছাড়া নিজ হাতে কখনো কাউকে মারেননি—না কোনো খাদেমকে, না কোনো নারীকে (স্ত্রী অথবা বাঁদি)। আমি কোনো দিন দেখিনি, তিনি নিজের জন্য কোনো জুলুমের বদলা নিয়েছেন। তবে আল্লাহ তাআলার ইজ্জতের অবমাননা হলে (অর্থাৎ, কেউ কোনো হারাম কাজ করলে) তাঁর চেয়ে অধিক বিক্ষুব্ধ কেউ হতো না।–*শামায়েল*

একবার জনৈক বেদুইন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদর ধরে সজোরে টান মারে। ফলে তাঁর ঘাড়ে ক্ষত হয়ে যায়। অতঃপর বেদুইন বলল, আমার এই উটগুলোকে খাদ্যশস্যে বোঝাই করে দাও। তুমি তোমার নিজের মাল অথবা তোমার বাপের মাল থেকে দাও না (বায়তুল মালের সবকিছু আমাদের—তোমার নয়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ চাদর টানার বদলা না নেওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে খাদ্যশস্য দেব না। সে বলল, আল্লাহর কসম, আমি

বদলা দেব না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতে হাসতে তার উট বোঝাই করিয়ে দিলেন।–*খাসায়েলে নববী*

পরকালচিন্তা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে দুনিয়াতে মুসাফিরের মতো মনে করতেন। পার্থিব বিলাস-ব্যসনের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি কার্যত এ হাদীসের নমুনা ছিলেন—

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

তুমি দুনিয়াতে প্রবাসী মুসাফির অথবা পথিকের মতো থাকো। –*নাশরুত তীব*

স্বভাবগত বিষয়াদি

সরওয়ারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানবীর ছিলেন। তিনি কোনো ভিক্ষুক বা প্রার্থীকে কখনো 'না' বলেননি। হাতে থাকলে তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিতেন, নতুবা অন্য সময়ে এসে নিয়ে যাওয়ার জন্যে নম্র ভাষায় বলে দিতেন।–*ইবনে সাদ*

তিনি কথায় সাচ্চা ছিলেন এবং সকলের বিষয়ে সহজ দিকটি অবলম্বন করতেন। যারা তাঁর সাথে ওঠা-বসা করত, তিনি তাদের খেয়াল রাখতেন এবং তাদের হাল-হাকিকত জিজ্ঞাসা করতেন। রাত্রিবেলায় বাইরে যেতে হলে সন্তর্পণে গাত্রোত্থান করতেন, আস্তে জুতা পরিধান করতেন, আস্তে কপাট খুলতেন এবং সন্তর্পণে বাইরে চলে যেতেন। অনুরূপভাবে ঘরে আগমন করলেও আস্তে আগমন করতেন এবং আস্তে সালাম করতেন, যাতে নিদ্রিতদের কষ্ট না হয় এবং কারও আরামে ব্যাঘাত না ঘটে। –*যাদুল মাআদ*

যখন কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করত এবং তিনি তাকে প্রফুল্ল দেখতেন, তখন তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিতেন, যাতে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায়।–*ইবনে সাদ*

যদি এমন কেউ আগমন করত, যার নাম পছন্দনীয় নয়, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম পাল্টে দিতেন।–*ইবনে সাদ*

গরিবদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে কেউ যাকাতের অর্থ নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে তিনি তাকে এই বলে দুআ দিতেন, হে আল্লাহ, অমুকের প্রতি রহম করুন।–*মুসনাদে আহমদ*

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও ঘরে গেলে তিনি দরজার ঠিক সামনে দাঁড়াতেন না, বরং ডান অথবা বাম দিকে কিছুটা সরে দাঁড়াতেন এবং ঘরের লোকজনকে তাঁর আগমনবার্তা পৌঁছানোর জন্যে বলতেন, আসসালামু আলাইকুম।–*আবু দাউদ, যাদুল মাআদ*

রাত্রিবেলায় কারও ঘরে গেলে তিনি এমন নিচু শব্দে সালাম করতেন, যা কেবল জাগ্রত ব্যক্তিই শুনতে পেত; কিন্তু এর কারণে কোনো নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হতো না।–*যাদুল মাআদ*

তিনি মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে পথ চলতেন। দলের সাথে চললে সবার পেছনে থাকতেন। কেউ সামনে এলে প্রথমে তিনি সালাম করতেন। তিনি বিনীতভাবে উপবেশন করতেন এবং গরিব-মিসকিনদের মতো বসে আহার করতেন। বিশেষ মেহমানদের স্বহস্তে আপ্যায়ন করতেন।–*যাদুল মাআদ*

তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন এবং প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। যখন কথা বলতেন, তখন পরিষ্কার করে বলতেন, যা শ্রোতা সহজে বুঝতে পারত। এত দীর্ঘ কথা বলতেন না, যাতে শ্রোতা বিরক্ত বোধ করে এবং এতটুকু সংক্ষেপেও বলতেন না, যাতে বক্তব্য অসামপ্ত থেকে যায়। তিনি কোনো কথায় ও কাজে রূঢ়তা প্রদর্শন করতেন না, বরং নম্রতা পছন্দ করতেন। তিনি আগন্তুকদের যথাযথ সম্মান করতেন। কারও কথা মাঝখানে কেটে দিতেন না। শরীয়তবিরোধী কথা হলে তাকে বাধা দিতেন অথবা নিজেই সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রতিটি নেয়ামতের কদর করতেন।–*নাশরুত তীব*

কেউ কোনো বস্তু ভেঙ্গে ফেললে অথবা কোনো কাজ নষ্ট করে দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করতেন না। তবে ইসলামবিরোধী কাজে তিনি ভীষণ রাগান্বিত হতেন।–*নাশরুত তীব*

তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো রাগ করেননি এবং প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি। কারও প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে হলে স্বীয় মুখমণ্ডল তার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিতেন, কিন্তু মুখে কটু কথা বলতেন না। সন্তুষ্টির সময়ে দৃষ্টি নত করে নিতেন। তিনি পর্দানশিন কুমারী কিশোরী অপেক্ষা অনেক বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। লজ্জার আতিশয্যে তিনি কারও মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকাতেন না এবং কখনো চোখে চোখ রেখে দেখতেন না। –*ইবনে সাদ*

দৈবাৎ কেউ তাঁর কাছ থেকে কোনো কষ্ট পেলে তিনি অকপটে তাকে বদলা নেওয়ার অধিকার দিতেন এবং কখনো এর বিনিময়ে তাকে কোনো বস্তু দিয়ে দিতেন।–*যাদুল মাআদ*

যদি কোনো দরিদ্র ব্যক্তি অথবা কোনো বাঁদি অথবা কোনো বৃদ্ধা তাঁর সাথে কথা বলতে চাইত, তবে পথের এক পাশেই তার কথা শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়তেন অথবা বসে যেতেন। কেউ অসুস্থ হলে তিনি তার অবস্থা জানার জন্যে যেতেন এবং কারও জানাযা হলে তিনি তাতে শরিক হতেন।–*যাদুল মাআদ*

সাহাবায়ে কেরাম সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তাদের সাথে মোসাফাহা করতেন এবং দুআ করতেন।–*নাসাঈ*

কারও নাম জানা না থাকলে এবং তাকে ডাকার দরকার হলে ইয়া আবদাল্লাহ (হে আল্লাহর বান্দা) বলে ডাকতেন।–*ইবনে সুন্নী*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ চলার সময় ডানে-বামে তাকাতেন না।–*হাকেম, ইবনে সাদ*

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের মন জয় করতেন। তিনি এমন ব্যবহার করতেন না, যাতে কেউ ঘাবড়ে যায়। জালেম ও ইতরদের থেকে সুন্দরভাবে আত্মরক্ষাও করতেন, কিন্তু সকলের সাথে

হাসিমুখেও চরম ভদ্রোচিত ব্যবহার করতেন। তিনি প্রত্যেক কাজ শৃঙ্খলার সাথে করতেন। উঠতে-বসতে আল্লাহকে স্মরণ করতেন। কোনো মজলিসে গেলে যেখানেই জায়গা পাওয়া যেত, বসে পড়তেন। কয়েকজনের সাথে কথা বললে পালাক্রমে সকলের দিকে মুখ করে কথা বলতেন। *–নাশরুত তীব*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনের কমে কুরআন শরীফ খতম করতেন না।*–ইবনে সাদ*

তিনি বৈধ কাজে নিষেধ করতেন না। কেউ তাঁর কাছে কিছু কামনা করলে যদি তার পূর্ণ করার ইচ্ছা হতো, তবে হ্যাঁ বলে দিতেন; নতুবা নীরব থাকতেন।*–ইবনে সাদ*

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো ভদ্র ও বিনয়ী কেউ ছিল না। কোনো সাহাবী অথবা পরিবারের কেউ তাঁকে ডাক দিলে তিনি জবাবে 'লাব্বাইক' (উপস্থিত আছি) বলতেন।*–যাদুল মাআদ*

তিনি নফল ইবাদত গোপনে করতেন, যাতে এ ইবাদত উম্মতের জন্যে কঠিন না হয়।*–যাদুল মাআদ*

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার সাথে এই মর্মে চুক্তি করেছি, আমি যাকে গালি দিই অথবা অভিসম্পাত করি, গালি ও অভিসম্পাত যেন সে ব্যক্তির জন্যে গুনাহের কাফফারা, রহমত ও নৈকট্যের উপায় হয়ে যায়।*–যাদুল মাআদ*

রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সৎকর্ম শুরু করলে তা সর্বদাই করতেন।*–আবু দাউদ*

দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ উঠলে তিনি বসে যেতেন এবং বসা অবস্থায় রাগ উঠলে শুয়ে পড়তেন, যাতে রাগ স্তিমিত হয়ে যায়।*–যাদুল মাআদ*

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু ও পানাহারের জন্যে ডান হাত ব্যবহার করতেন

এবং বাম হাত ইস্তেঞ্জা ইত্যাদি কাজের জন্যে ব্যবহার করতেন।–*যাদুল মাআদ, আবু দাউদ*

সাহাবীদের মধ্যে কেউ সাক্ষাৎ করতে এসে যতক্ষণ অবস্থান করত, তিনিও ততক্ষণ তার সাথে অবস্থান করতেন এবং যতক্ষণ সে নিজে প্রস্থান না করত, ততক্ষণ তিনি বসেই থাকতেন। কেউ তাঁর হাতে হাত দিতে চাইলে তিনি নিজের হাত বাড়িয়ে দিতেন এবং যতক্ষণ সে হাত না ছাড়ত, তিনি হাত ছাড়িয়ে নিতেন না।–*ইবনে সাদ*

এক রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, যে পর্যন্ত না সে নিজে মুখ ফিরিয়ে নিত। কেউ কানে কানে কথা বলতে চাইলে তিনি নিজের কান তার দিকে পেতে দিতেন এবং তার কথা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সরাতেন না।–*ইবনে সাদ*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের কাছ দিয়ে যাবার সময় তাদেরকে সালাম করতেন।–*যাদুল মাআদ*

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে সে ভীত হয়ে যেত। যে ব্যক্তি ঘনিষ্ঠ হয়ে তাঁর সাথে মেলামেশা করত, তিনি তাকে মহব্বত করতেন। আমি তাঁর মতো সুশ্রী ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব তাঁর পূর্বেও দেখিনি এবং পরেও দেখিনি।–*নাশরুত তীব*

আনন্দের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টি নামিয়ে নিতেন। কারও সম্পর্কে তিনি খারাপ কোনো কিছু জানতে পারলে নির্দিষ্ট করে তার সমালোচনা করতেন না; বরং বলতেন, লোকদের কী হলো যে, তারা এমন এমন কুকর্ম করে?–*শামায়েলে তিরমিযী, আবু দাউদ*

রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখে এমন কথাই বলতেন, যদ্দ্বারা সাওয়াব পাওয়া যায়। কোনো ভিনদেশি আগমন করলে তিনি তার খবরাখবর নিতেন। প্রত্যেকের সাথে তিনি এমন ব্যবহার করতেন, যদ্দ্বারা সে মনে করত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সর্বাধিক

ভালোবাসেন। কেউ আলাপ করতে বসলে সে নিজে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি উঠতেন না।–*নাশরুত তীব*

উদ্বেগ

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তাযুক্ত হলে আকাশের দিকে মাথা তুলে 'সুবহানাল্লাহিল আযীম' বলতেন এবং অত্যধিক আবেগের সাথে দুআ করার সময় 'ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম' বলতেন।–*তিরমিযী*

এক রেওয়ায়েতে আছে, চিন্তার মুহূর্তে প্রায়ই তিনি দাড়িতে হাত বুলাতেন, কখনো অঙ্গুলি দ্বারা দাড়ি খেলাল করতেন এবং বলতেন, আমার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কার্যনির্বাহী। –*যাদুল মাআদ*

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সৌন্দর্য

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি থাকত অবনমিত। এদিক-সেদিক তিনি কেবল দেখতেই থাকতেন না। খুব ভালো করে চোখ মেলে চাইলে সেটা কেবল পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত হতো। চোখ বড় বড় করে কোনো দিকে তিনি তাকাতেন না। ওপর দিকে দৃষ্টির তুলনায় তার দৃষ্টি অধিকাংশই নিচের দিকে থাকত।

সাহাবীদের সাথে নিয়ে চলার সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে নিয়ে অগ্রসর হতেন। কখনো সাহাবীদের সামনে নিয়ে তিনি হেঁটে যেতেন। তাদের পেছনে ফেলতেন না। যার সাথে সাক্ষাৎ হতো, সালাম দিয়েই সেটা শুরু হতো। তিনিই আগে সালাম দিয়ে দিতেন।

কথা বলার সময় গভীর ও ব্যাপক অর্থবোধক কথা বলতেন। কথাবার্তা খুবই স্পষ্ট ও ধীরগতিসম্পন্ন হতো। বাড়তি কথা একদম বলতেন না। আর তা অতি সংক্ষিপ্তও হতো না। প্রয়োজনমতো কথা বলতেন। এটাই প্রজ্ঞাময় ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তিনি বলতেন—

من حسن اسلام المرء تركه مالا يعني

কোনো ব্যক্তির দীনের সৌন্দর্য হলো, তার অর্থহীন কাজ বা কথা পরিত্যাগ করা।

তিনি আরও বলেছেন—

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت

যে আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে সে হয়তো ভালো কথা বলবে, নয়তো চুপ থাকবে।

কথার প্রসঙ্গ ও সূত্রসহ তিনি কথা এমনভাবে গুছিয়ে বলতেন, যার শুরু ও শেষ উভয়টিই পূর্ণাঙ্গ হতো। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেনই না। সুদীর্ঘ নীরবতা ছিল তাঁর চির অভ্যাস।

লাগাতার উদ্বিগ্ন। চিরচিন্তাশীল। মনে হয়, যেন তার বিন্দুমাত্র স্বস্তি নেই। সদাসর্বদা চিন্তা ও ভাবনায় নিমগ্ন। গভীর ধ্যানে নিমজ্জিত। অমায়িক, সদাচারী। খুবই স্বাভাবিক তার ব্যক্তিগত আচরণ। ব্যক্তিত্বহীন হালকা বা দম্ভপূর্ণ কঠোর—এর একটিও না। আল্লাহর ক্ষুদ্র কোনো নেয়ামতকেও খুবই বড় বলে প্রকাশ করতেন। গুরুত্বসহ উল্লেখ করতেন। কোনো নেয়ামতেরই দোষ খুঁজে বের করতেন না।

পার্থিব বিষয় কখনো তাকে ক্রোধান্বিত করেনি। দুনিয়া নিয়ে তিনি কোনো দিন রাগ করেননি। আল্লাহর কোনো অধিকার বাস্তবায়নে তিনি এমনই ক্রোধান্বিত হতেন, যা দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে, এই সেই নবীজি।

তিনি রাগান্বিত হলে তার সামনে কোনো কিছুই টিকে থাকতে পারত না। ব্যক্তিগত কোনো কারণে তিনি জীবনে কোনো দিনই রাগান্বিত হননি আর পার্থিব কারণে কারও ওপর বিজয়ীও হননি।

রাগ হলে তিনি চেহারা ফিরিয়ে নিতেন এবং পবিত্র মুখমণ্ডল তাঁর লোহিতবরণ ধারণ করত। আনন্দিত হলে চক্ষু মুদে আসত। উৎফুল্লতায়

তিনি চোখের পলক ফেলতেন। খুব বেশি হাসলেও তা মুচকি হাসির পর্যায় পেরুত না।

গুরুত্বপূর্ণ কথা জোর দিয়ে বলতে হলে তিনবার করে বলতেন। সালাম তিনবার দিতেন। অনুমতি চাইলেও তিনবার চাইতেন। রাসূল হিসেবে উম্মতকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালনে নিষ্ঠার জন্যই তিনবার করে বুঝিয়ে বলতেন।

সাহাবীদের আলাপ-আলোচনায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন। ওদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতেন। সাহাবীরা দুনিয়া প্রসঙ্গ আলাপ করলে তিনিও তাতে হিস্যা নিতেন। তারা আখেরাতের কথা বললে তিনিও শরিক হতেন। সাহাবীরা খাবার-দাবার নিয়ে আলোচনা করলে তিনি এতেও অংশ নিতেন।

বসার সময় কখনো দু'টো পা খাড়া রেখে হাত দিয়ে বেঁধে বসতেন। আর খাবার সময় ডান পা উঠিয়ে অপর পা বিছিয়ে বসতেন। সামনে যে খাবার পেশ করা হতো, এর কোনোটারই কখনো দোষ ধরেননি। পছন্দ হলে খেতেন। খাওয়া সম্ভব না হলে রেখে দিতেন।

এ সবই পরম সুন্দর আদর্শ। এর প্রতিটিই মহব্বত ভরা হৃদয়ে আঁকড়ে ধরা যায়। অন্তর দিয়ে আমল করা যায় এগুলোর ওপর। মানব-চরিত্রের চরম উৎকর্ষতার শেষ ধাপ হলো প্রিয়তম নবীর প্রতিটি আদর্শ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

প্রিয় নবীজির বদান্যতা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দিন কোনো প্রার্থীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি। তার হাতে আছে, এমন সব কিছুই তিনি বিলিয়ে দিতেন। এক ব্যক্তি পরনের চারদটি দেখে বলল, খুব সুন্দর তো। আমার যদি এমন থাকত! হুযুর গৃহে প্রবেশ করে অন্য কাপড় পরে এটি তাকে দিয়ে দিলেন।

সহীহ বুখারী ও *মুসলিম শরীফে* হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চাওয়া

হলে তিনি কোনো দিন 'না' বলতেন না। আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হেদায়েতের জন্য কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই তা দান করে দিতেন। একবার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকাভরা ছাগলের একটি পাল তিনি এক ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন। লোকটি তার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলল, হে আমার জাতি, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন উদার হস্তে দান করে থাকেন, যারপর আর ক্ষুধা-দারিদ্র্যের ভয় থাকে না।

বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট জানতে চাওয়া হলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানশীলতা কীরূপ ছিল? ইবনে আব্বাস জবাব দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল ছিলেন। পবিত্র রমযানে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম যখন তাঁকে পাক কুরআন পুনরাবৃত্তি করে শোনাতে থাকতেন, তখন হুযুরের বদান্যতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য বিপুল হারে বেড়ে যেত। হুযুর সে সময় প্রবহমাণ হাওয়ার গতির চেয়ে বেশি মুক্ত হাতে দান করতে থাকতেন—অর্থাৎ, মুক্ত হাওয়ার অবাধ প্রবাহ যেমন গতিশীল, হযরতের দান ও অনুগ্রহ তখন তারচেয়েও বেশি গতিময়তা লাভ করত।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নব্বই হাজার রৌপ্যমুদ্রা এনে জমা করা হলো। তিনি এগুলো একটি চাটাইয়ের ওপর রাখতে বললেন। চাটাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সবগুলো মুদ্রা বিলিয়ে দিয়ে তবে স্বস্তি লাভ করলেন। মুদ্রা ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোনো প্রার্থীকেই বিমুখ করেননি।

হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একবার এত স্বর্ণ দান করলেন, যা তাকে খুব কষ্ট করে বহন করে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

হুযুরের জন্য কাঁচা খেজুর আর শশাজাতীয় একটি ফল হাত ভরে নিয়ে এলেন হযরত মুআজ ইবনে আফরা রাযিয়াল্লাহু আনহু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণালঙ্কার দিয়ে তার হাত দু'টো পূর্ণ করে তাকে বিদায় করলেন।

এক ব্যক্তি এসে হুযুরের নিকট কিছু সাহায্য চাইল। তিনি বললেন, আমার হাত তো খালি। তুমি আমার নামে বাকিতে বাজার করে ফ্যালো, পরে আমি তা আদায় করে দেবো।

প্রিয়তম নবী আমার কেনইবা এত উদার হবেন না। তিনি তো দাতাদের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। হুযুর নিজেই তো বলেছেন, প্রতিদিন ভোরবেলা দু'জন ফেরেশতা বান্দাদের জন্য দুআ করেন। এদের একজন বলেন, হে আল্লাহ, সম্পদ ব্যয়কারী দাতাকে তুমি প্রবৃদ্ধি দাও। অপর ফেরেশতা দুআ করেন, হে আল্লাহ, হাত গুটিয়ে রাখা ব্যক্তিকে তুমি ঘাটতির সম্মুখীন করো। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে থাকেন, হে আদম-সন্তান, তুমি ব্যয় করো, আমি তোমাকে দান করব। মহান আল্লাহ তার ওপর এ প্রতিশ্রুতিও নাযিল করেছেন, যে কোনো জিনিস আপনি দান করেন, তারই একটা প্রতিদান এর পিছু পিছু আসে। আর আল্লাহই সর্বোত্তম রিজিকদাতা।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক দানশীল ছিলেন (দানশীলতায় কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারত না)। তিনি নিজে দরিদ্রের জীবন-যাপন করতেন; কিন্তু দানে রাজা-বাদশাহদেরকেও ছাড়িয়ে যেতেন। একবার অত্যন্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে এক মহিলা একটি চাদর পেশ করলে তিনি তা পরিধান করলেন। কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি এসে চাদরটি চাইলে তিনি হাসিমুখে তা দিয়ে দিলেন। তিনি ঋণ করে হলেও অভাবীদের অভাব দূর করতেন। ঋণদাতার কঠোর তাগিদের সময় যদি কারও কাছ থেকে কিছু পেতেন এবং ঋণ পরিশোধের পর কিছু থেকে যেত, তবে তা অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বণ্টন না হওয়া পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ করতেন না। বিশেষত রমজান মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ করতেন না। বিশেষত রমজান মাসের উদারতাও অন্যান্য মাসের উদারতার সমান হতো না। এই মোবারক মাসে যখনই হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আগমন করতেন এবং তাঁকে আল্লাহর কালাম পাঠ করে শোনাতেন, তখন তিনি পরোপকারের ক্ষেত্রে প্রবল বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ অপেক্ষাও অধিক দান করতেন।—*খাসায়েলে নববী*

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একবার নব্বই হাজার দিরহাম আগমন করলে তিনি একটি মাদুরের ওপর তা রেখে দিলেন এবং সেখান থেকেই সমুদয় দিরহাম বণ্টন করে দিলেন। খতম হয়ে যাওয়ার পর এক ভিক্ষুক আগমন করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কাছে তো কিছুই অবশিষ্ট নেই। তুমি আমার নামে কারও কাছ থেকে কর্জ নিয়ে নাও। সুযোগ পেলেই আমি এ কর্জ পরিশোধ করে দেব।–*খাসায়েলে নববী*

হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, কখনো এমন হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু চাওয়া হলে তিনি 'দেব না' বলেছেন। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামীকালের জন্যে কোন বস্তু তুলে রাখতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা এই, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক দানশীল ছিলেন; বিশেষ করে রমযান মাসে তো তাঁর দানের কোন সীমা-পরিসীমাই থাকত না।–*সহীহ বুখারী*

একবার রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, হে আবু যর, আমার কাছে ওহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ থাকবে এবং তৃতীয় দিন পর্যন্ত তার মধ্যে থেকে একটি আশরাফিও অবশিষ্ট থেকে যাবে, এমনটা আমি পছন্দ করি না। যদি থাকেই, তবে সেটা ঋণ পরিশোধের জন্যেই থাকবে। হে আবু যর, এমন সম্পদ আমি দু'হাতে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে বণ্টন করে উঠব।–*সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ইস্তেকরায

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছয়টি আশরাফি এসেছিল। চারটি আশরাফি তিনি ব্যয় করতে পারলেন এবং দু'টি অবশিষ্ট রয়ে গেল। এগুলোর কারণে সারা রাত তিনি ঘুমাতে পারেননি। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা আরজ করলেন, নিতান্তই মামুলি ব্যাপার। ভোর হলেই এগুলো খয়রাত করে দেবেন। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে হুমায়রা, এর কী নিশ্চয়তা আছে, ভোর পর্যন্ত আমি জীবিত থাকব?–*মেশকাত*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো সদকা ইত্যাদির মাল আগমন করলে তিনি তা দরিদ্র ও যোগ্য লোকদের মধ্যে নিঃশেষে বণ্টন না করা পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ করতেন না।–*নাশরুত তীব*

তিনি যখন কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখতেন, তখন নিজের আহার্যটুকু পর্যন্ত তার হাতে তুলে দিতেন, অথচ তাঁর নিজেরও তখন প্রয়োজন থাকত।

তিনি বিভিন্ন উপায়ে দান করতেন—কাউকে কোনো বস্তু দিয়ে দিতেন, কাউকে তার প্রাপ্য দিতেন, কাউকে কিছু উপঢৌকন দিতেন এবং কখনো কাপড় কিনে তার মূল্য পরিশোধ করার পর সেটি বিক্রেতাকেই দিয়ে দিতেন। তিনি কখনো উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং দাতাকে কয়েক গুণ বেশি পুরস্কার দান করতেন।–*মাদারিজুন নবুওয়াত*

হযরত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কারও কিছু চাওয়ার জবাবে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো অস্বীকার করেননি। তখন জিনিসটি তাঁর কাছে থাকলে দিয়ে দিতেন, নতুবা অন্য সময় দেওয়ার ওয়াদা করতেন। অথবা তার জন্যে দুআ করতেন, আল্লাহ তাআলা অন্য কোনো পন্থায় যেন তার বাসনা পূর্ণ করে দেন।–*শামায়েলে তিরমিযী*

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভাব্য সকল উপায়ে খয়রাত ও দান বণ্টন করতেন। এতদসত্ত্বেও স্বয়ং তাঁর জীবন ফকিরের মতোই অতিবাহিত হতো। এক মাস, দু'মাস অতিক্রান্ত হয়ে যেত, তাঁর ঘরে চুলা পর্যন্ত জ্বলত না। প্রায়ই তীব্র ক্ষুধার কারণে তিনি পেটে পাথর বাঁধতেন। তাঁর এই দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতা অর্থাভাবের কারণে ছিল না, বরং এর কারণ ছিল সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও দানশীলতা। তিনি কখনো বিবিগণের জন্যে এক বছরের খোরপোশ দিয়ে দিতেন এবং নিজের জন্যে কিছুই রাখতেন না।–*মাদারিজুন নবুওয়াত*

রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিষ্ণুতা

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পরম সহিষ্ণু। সহিষ্ণুতা হলো ক্রোধের সময় এমন কোনো কথা বা কাজ থেকে নিজেকে বিরত

রাখা, যা ধৈর্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বাইরের কোনো কথা, আচরণ বা ক্রিয়ায় নিজের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলেও তার বহিঃপ্রকাশ কোনো অশোভনীয় কথা বা অপছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে না করা। হযরত রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এ মহামূল্যবান গুণের আধার। এটা ছিল আল্লাহ পাকের শেখানো উন্নত চরিত্রের অংশবিশেষ। আমার পিতামাতা ও সকল পরিজন তার ওপর প্রাণ উৎসর্গ করুক।

প্রিয় নবীজির মুখমণ্ডল যেদিন ক্ষতবিক্ষত হয়, ওহুদের রণাঙ্গনে যেদিন তার পবিত্র দু'টো দাঁত শহীদ হয়, হযরতের লৌহ শিরস্ত্রাণের একটি আংটা গিয়ে যখন গভীরভাবে তাঁর চেহারায় ঢুকে পড়ে, তখনও তিনি কেবল 'হে আল্লাহ, আমার জাতিকে তুমি ক্ষমা করে দাও। কেননা, তারা জানে না।'—এই দুআই করতে থাকেন। সহিষ্ণুতার এটাই সর্বশেষ সীমা; সহ্য, ধৈর্য, ক্ষমা ও নম্রতার অন্তিম পরিধি।

যুল খুয়াইসিরা যেদিন তাঁকে বলল, 'ইনসাফ করুন! এই বণ্টন দিয়ে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করছি।' প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন তার ব্যাপারে পরম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, 'একি বলছ তুমি! আমি যদি ইনসাফ না করি, তা হলে ইনসাফ আর কে করবে?' সে লোকটির কথায় তিনি রাগ করেননি বা তার কোনো সাহাবীকেও ক্রোধান্বিত হওয়ার সুযোগ দেননি।

একদিন একজন গেঁয়ো বেদুইন হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গলার চাদরে ধরে এমন জোরে টানাটানি শুরু করে দিল যে, হযরতের শুভ্র নরম গলা ও ঘাড়ে রক্ত জমে জায়গাটি লাল হয়ে উঠলো। বেদুইন চাদর টানে আর বলে, তোমার নিকট রক্ষিত আল্লাহর সম্পদ দিয়ে তুমি আমার এ উট দু'টো বোঝাই করে দাও। তুমি আমাকে তোমার নিজের বা তোমার পিতার সম্পদ দিচ্ছ না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিষ্ণুতা অবলম্বন করলেন। শান্ত-ধীর কণ্ঠে বললেন, সম্পদ তো আল্লাহরই আর আমি তাঁর গোলাম। কিন্তু হে বেদুইন, তুমি আমার সাথে যে আচরণ করলে এর কি কোনো বদলা হওয়া উচিত নয়? বেদুইন বলল, না, উচিত না। হুযুর জানতে চাইলেন, কেন? বেদুইন উত্তর দিল,

কারণ তুমি তো মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে দাও না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওর কথা শুনে হেসে উঠলেন এবং ওর এক উট যব দিয়ে আর অপরটি খেজুর দিয়ে বোঝাই করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ কেমন সহিষ্ণুতা! সহ্য ও ধৈর্যের কোন স্তর এটি!

কোনো দিন তিনি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে কারও ওপর প্রতিশোধ নেননি। কোনো খাদেম, কর্মচারী বা বিবির গায়ে হাত তোলার ঘটনা থেকেও তাঁর জীবন পবিত্র। মহানবীর জীবন-সঙ্গীনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনায় রয়েছে, হযরত কোনো দিন তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ে কারও ওপর প্রতিশোধ নেননি। নির্যাতিত হয়েও তিনি এর বদলা নেননি। তবে আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘিত হলে তিনি কঠোর হতেন। আল্লাহর রাহে জিহাদ করার সময় ব্যতীত তিনি তাঁর পবিত্র হাতে কারুর ওপর কোনো দিন আঘাত করেননি। খাদেম, কর্মচারী, স্ত্রী বা অধীনস্থ কারও গায়ে টোকা পর্যন্ত কোনো দিন দেননি তিনি।

যায়েদ ইবনে সানাহ মদীনার ইহুদি ধর্মযাজক। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছে পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে। প্রথমে হযরতের কাঁধ থেকে চাদরটি টেনে নিয়ে সে প্রিয় নবীর জামায় ধরে টানতে লাগল। বলল, তোমরা আবদুল মুত্তালিবের গোষ্ঠীর লোকজন বড়ই টালবাহানা করতে পার। হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু উঠে পড়লেন এবং ইহুদিটিকে খুব কড়া ভাষায় একটা ধমক দিয়ে সাবধান করে দিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে তখন মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে। হযরত বললেন, আমি আর ও দু'জনই তোমার কাছে ভিন্ন কিছু আশা করেছিলাম। আমাকে তুমি ঋণ আদায়ের তাগাদা করবে আর ওকে বলবে, আরও সুন্দরভাবে পাওনা আদায় করতে। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঋণ আদায়ের সময় কিন্তু আরো তিন দিন রয়ে গেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পাওনা আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, হুমকি প্রদানের বিনিময়ে আরও বিশ ছা'অ ওকে বেশি দিয়ে দেবে। এ উদারতা ও সুবিচারই এ লোকটির ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে দেখা দেয়। ইহুদি ধর্মযাজক লোকটি মুসলমান হয়ে যায়। ধর্মতত্ত্ববিদ এ

লোকটি আগে বলত, মুহাম্মদের মাঝে নবুওয়াতের সকল নিদর্শনই আমি পেয়ে গেছি, তবে দু'টো বিষয় আমার এখনো পাওয়ার বাকি : এক. সহিষ্ণুতা তাঁর নিরক্ষরতা ছাড়িয়ে যাবে। অতিশয় বড় কোনো ঔদ্ধত্যও তাঁর সহিষ্ণুতার বাঁধ ভাঙতে পারবে না। এ ঘটনার মাধ্যমে সে এ বিষয়টিই যাচাই করল এবং ইসলামের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে প্রিয় নবীর সহচরে পরিণত হলো। পৃথিবীর কোনো ধৈর্য, সহিষ্ণুতা আর ক্ষমা মহানবীর এ ঘটনার সাথে তুলনীয় হতে পারে? প্রিয় নবীজির এ গুণটি হাসিল করার মাধ্যমে উম্মত কি পারে না তাদের জীবন সুন্দর করে সাজাতে?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঔদার্য ও ক্ষমা

ঔদ্ধত্য, বেয়াদবি বা চরম অপরাধের প্রতিকার করার শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিকার না করার নাম ক্ষমা—এ হলো মানব-চরিত্রের জন্য শোভনীয় একটি মহৎ গুণ।

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে আছেন। সাহাবীরাও বিশ্রাম নিচ্ছেন। এক যুদ্ধ থেকে তারা ফিরছেন। হুযুরের চোখ খুলল। তিনি দেখতে পেলেন, গাওরাস ইবনুল হারেস দাঁড়িয়ে আছে। চোখে তার খুনের নেশা। বুকভরা আক্রোশ। হুযুরের ওপর তার উদ্যত খোলা তরবারি। গাওরাস বলল, আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? হুযুর দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, আল্লাহ! গাওরসের হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। হুযুর এবার সেটি হাতে নিয়ে গাওরাসকে নিশানা করলেন। বললেন, এবার তোমাকে বাঁচাবে কে? গাওরাস সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলল, তোমার সৌজন্য কামনা করি। হযরত তাকে ছেড়ে দিলেন এবং ক্ষমাও করে দিলেন। নিজের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে গাওরাস বলল, সর্বোত্তম মানুষটির নিকট থেকে আমি এখন তোমাদের কাছে এলাম।

মহাবিজয়ের দিন হযরত তাঁর দশ হাজার ভক্ত সাহাবীকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে বায়তুল্লাহ শরীফে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। মক্কার কাফের নেতৃবৃন্দ অবিশ্বাসী জনগণকে নিয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে, তাদের ওপর বিজয় অর্জনকারী মানুষটির হুকুমের অপেক্ষায়। দয়ার সাগর, ক্ষমার

প্রতীক হযরত বললেন, হে কুরাইশ, হে লোকসকল, আমার আচরণ কেমন হবে বলে তোমাদের ধারণা? তারা বলল, সজ্জন ভাই, মহান ভ্রাতুষ্পুত্র! হুযুর ঘোষণা দিলেন, যাও, তোমরা সবাই আজ মুক্ত! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। তাঁর প্রতি, তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের ওপর সীমাহীন অত্যাচার, অবর্ণনীয় উৎপীড়নের কোনো সাজাই তিনি সেদিন কাউকে দেননি।

লাবীদ নামের এক ইহুদি হুযুরকে যাদু করে। এতে প্রিয় নবী খুবই বিব্রত হন। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা মারফত এ সংবাদ এবং যাদু কেটে যাওয়ার দুআ নাযিল করলেন। হুযুর সব কিছু জানতে পেরেও লাবীদকে কিছুই বলেননি। সাজা দেওয়া তো দূরের কথা ওকে তিনি মুখের কথাটিও বললেন না।

তাবুকের যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরে আসার সময় মুমিনের ছদ্মবেশধারী কাফের বা মোনাফেকরা হুযুরের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করে। ওহীর মাধ্যমে হযরত এ সংবাদ জানতে পেরেও এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। তিনি এদের ক্ষমা করে দেন এবং বলেন, আমি চাই না, লোকে এ কথা বলুক, মুহাম্মদ তাঁর সাথিদের প্রাণ নিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বীরত্ব ও শৌর্য

শৌর্য বা বীরত্ব প্রশংসনীয় গুণ। বুদ্ধি-বিবেক ও হৃদয়-মনে যখন একই ধরনের প্রত্যয় নিয়ে কেউ সাহসিকতার সাথে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে, পাশাপাশি তার অন্তরে ঈমান ও ইলম থাকে, তখন এর মতো সদগুণ আর হয় না। মানুষ যা করতে ভয় পায়, তা নির্ভীক চিত্তে করার নাম বীরত্ব। বীরত্ব বলে সত্য ও ন্যায়ের সপক্ষে অকম্পিত সিদ্ধান্ত নেওয়াকে। পরিণতির ভয় না করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের নাম শৌর্য আর বীরত্ব। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানব-বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ। গোটা বৈরী বিশ্বের বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ পাক বলেছিলেন—

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অতএব, আল্লাহর পথে লড়াই করুন। কেবল নিজকেই এ কাজে প্রবৃত্ত করুন আর ঈমানদারগণকে অনুপ্রাণিত করুন।

পরিবারবর্গের সাথে অন্তরঙ্গ পরিবেশে

বাড়িতে তিনি সাধারণ মানুষের মতো থাকতেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাষায়—তিনি নিজের কাপড়গুলো পরিষ্কার করতেন; ছাগলের দুধ দোহাতেন; নিজের কাজ নিজেই করতেন। নবীপত্নী আরও বলেন, তিনি কাপড়ে তালিও লাগিয়ে ফেলতেন। জুতা ঠিক করে নিতেন। এ ছাড়া এ ধরনের সব কাজই করতেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হুযুর বাড়িতে কীভাবে থাকতেন? কী করতেন? হযরত আয়েশা জবাবে বলেন, তিনি ঘরোয়া কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকতেন। নামাযের সময় হলে নামাযের জন্য বাইরে চলে যেতেন।–*সহীহ বুখারী*, কিতাবুস সালাত

এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি জুতো সেলাই করে নিতেন, কাপড় রিফু করতেন। যেমন তোমরা কেউ কেউ নিজের গৃহে করে থাকো। –*মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক* হাদীস নং : ২০৪৯২, খণ্ড ১১/২৬০।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, তিনি সকল মানুষের চেয়ে বেশি নম্র, কোমল ও সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ছিলেন। তিনি হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন।–*ইবনে আসাকির*

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশি দয়ালু ও স্নেহবৎসল আর কাউকে দেখিনি।–*মুসনাদে আহমদ* (আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায়), *সহীহ মুসলিম*

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো খাদ্যদ্রব্যের দোষ ধরেননি। ইচ্ছে হলে

খেয়েছেন আর পছন্দ না হলে রেখে দিয়েছেন।–*সহীহ বুখারী*, খাদ্যদ্রব্য পর্ব; –*সহীহ মুসলিম*

বিপদসঙ্কুল অবস্থায় অগ্রণী ভূমিকা পালন ও সুসময়ে সংযম

নিজের পরিবারবর্গ, আত্মীয়-পরিজন ও নিকটতম লোকদের সাথে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ ছিল আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। যে তাঁর যতটুকু আপন, বিপদ-আপদ ও মুসিবতের সময় তাকে তিনি তত বেশি আগে বাড়িয়ে ধরতেন। আর পুরস্কার ও প্রশংসার ক্ষেত্রে তাকে রাখতেন সবার পেছনে।

যখন কুরাইশ-বীর উতবা, শায়বা ও ওলীদ ইবনে উতবা একবার মুসলমানদের রণে আহ্বান করল, তখন তাদের সাথে শক্তি পরীক্ষার জন্য তিনি হামযা, আলী ও উবায়দাকে ডাকলেন এবং এদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে বললেন, অথচ তখন হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে এমন সব প্রখ্যাত ঘোড়সওয়ার ও বীরযোদ্ধা ছিলেন, যাদের পারদর্শিতা সম্পর্কে হুযুর ভালোভাবেই পরিজ্ঞাত ছিলেন, যারা অনায়াসে ওদের তিনজনকে ঘায়েল করতে সক্ষম। হযরত হামযা, আলী ও উবায়দার বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও অপরিহার্যতাও হুযুরের জানা ছিল। বনু হাশেমের এ তিনজন মানুষ ছিলেন রক্ত ও বংশের দিক দিয়ে রাসূলে খোদার সর্বাধিক নিকটবর্তী। আত্মীয়তার বন্ধনেও ওরা নবীজির একান্ত আপনজন; কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপদমুক্ত রেখে অপরাপর সাহাবীগণকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারলেন না। আল্লাহ্ পাক প্রিয় নবীর এ তিনজন প্রিয় ব্যক্তিত্বকেই সাহায্য করলেন। প্রত্যেকেই দুশমনকে পরাজিত ও ঘায়েল করে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করলেন। হযরত হামযা ও আলী সম্পূর্ণ নিরাপদে শিবিরে ফিরে এলেন। হযরত উবায়দাকে আহত অবস্থায় সাথিরা নিয়ে এলেন।

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সুদকে হারাম বলে এবং ইসলামপূর্ব যুগের রক্তপণ মওকুফ করে ঘোষণা প্রদান করেন, তখন এর সূচনা করেন আপন চাচা হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ও

চাচাতো ভাই হযরত রবীআ ইবনুল হারেস ইবনে আবদিল মুত্তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে।

বিদায় হজের সময় হুযুর তাঁর খুতবায় বলেন, জাহেলি যুগের সকল সুদ আজ শেষ এবং নিশ্চিহ্ন। আর প্রথম সুদ, যা আমি নিশ্চিহ্ন বলে ঘোষণা করছি, তা হলো আমার চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সমুদয় সুদ। জাহেলি যুগের রক্তের বদলাও আজ শেষ আর এর সূচনাও আমারই আত্মীয় রবীআ ইবনুল হারেসের রক্ত।–*আবু দাউদ, সহীহ মুসলিম*

শান্তি, আরাম, পুরস্কার ও প্রতিফলের বেলায় তিনি এসব নিকটাত্মীয় বা বংশসম্পৃক্ত ব্যক্তিগণকে কোনো গুরুত্ব দিতেন না। সাধারণ মানুষের তুলনায় বরং এসব আত্মীয়-স্বজনকে আরও পেছনে ফেলে রাখতেন।

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আটা ও যবের চাকি পিষতে ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার বড়ই কষ্ট হতো। এ সময় তিনি খবর পেলেন, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু দাসী এসেছে। ফাতেমা উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, তার কাজে সহায়তার জন্য তাকে যেন একটি দাসী দেওয়া হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করলেন না। হযরত ফাতেমা এ বিষয়টি নিয়ে মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে আলাপ করলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যাপারটি বললেন। ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর রাসূল রাতের বেলা আমাদের গৃহে তাশরিফ নিয়ে এলেন। আমরা তখন শুয়ে পড়েছি। তাঁকে দেখে আমরা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছি, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঘুমোও, উঠো না তোমরা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মোবারকের শীতলতা আমি আমার বুকে অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তুমি যা চেয়েছ, তারচেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তুর কথা কি আমি তোমায় বলব? তুমি যখন ঘুমুতে যাবে, তখন শুয়ে শুয়ে ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ আর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ বলো। এ তোমাদের জন্য তারচেয়ে উত্তম, যা তোমরা আমার নিকট চেয়েছিলে।–*সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ

অপর এক বর্ণনায় এক ঘটনার সাথে এ বাক্যাংশটুকু এসেছে, হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহার কথার উত্তরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, সুফফাবাসীদের অভুক্ত রেখে খোদার শপথ আমি তোমাকে কিছু দিতে পারি না। ওদের জন্যে ব্যয় করার মতো কিছুই আমার হাতে নেই। আমি এসব (দাস-দাসী) বিক্রি করে সুফফাবাসীদের ব্যয়ভার মেটাবো।-বর্ণনায় আহমদ, *ফতহুল বারী* : ৭/২৩, ২৪

আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক

আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগি ও আনুগত্যের পরম আগ্রহ, পৃথিবী ও পার্থিব সামান-আসবাবের সাথে তাঁর অসংযোগ, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ মনোবৃত্তি, মহান রবের প্রতি পূর্ণ আত্মনিবেদন ও প্রত্যাবর্তন এবং মহান মাওলার সকাশে তাঁর সদা উপস্থিতি, মনোলগ্নতা, আহাজারি, দুআ, কান্নাকাটি ও মোনাজাত—এ সব কিছু পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও মানুষের সাথে হযরতের হাসিমাখা ব্যবহার, মধুময় চরিত্র, প্রীতিময় লালিত্যপূর্ণ আচার ও হৃদ্যতাভরা আচরণে কোনোরূপ কমতি ঘটত না। প্রতিটি মানুষকে তার বৈধ অধিকার প্রদান, নিজ নিজ মর্যাদা ও স্তর অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করতেও কোনো বিঘ্ন দেখা দেয়নি। তা ছাড়া এ দু'টো ধারার সুসংমিশ্রণ ও সফল বিন্যাস, এমন সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়া তিনি ছাড়া আর কোনো আদমসন্তানের পক্ষেই সম্ভব নয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জেনে ফেলতে তা হলে তোমরা হাসতে খুব কম, কাঁদতেই বেশি।-*সহীহ বুখারী ও মুসলিম*

মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি উদারহৃদয় ও কোমল অন্তর তাঁর ছিল। তাঁর বংশধারাই মানবজাতির সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল ধারা। তিনি তাঁর সাহাবা-সহচরবৃন্দের সাথে মিলেমিশেই জীবনযাপন করতেন। ওদের ছেড়ে একাকী হতেন না। তাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। সাহাবাগণের বাচ্চাদের তিনি কোলে নিতেন, ছোট্ট শিশুকে কোলের ওপর বসাতেন,

ছোট্টমণিদের সাথে মজার মজার কথা বলতেন, ওদের হৃদয়ের সন্নিকটে গিয়ে তিনি একটু হাস্যরসিকতাও করতেন।

সাধারণ নাগরিক, ক্রীতদাস, বাঁদি-দাসী, ধনী-গরিব, ছিন্নমূল মানুষ, নারী-পুরুষ সবার ডাকে তিনি সাড়া দিতেন। সানুগ্রহে এদের নিমন্ত্রণ কবুল করতেন। রুগ্‌ণ–পীড়িত মানুষকে তিনি দেখতে যেতেন। নগরীর অন্তিম সীমান্তে কেউ অসুস্থ হলেও তিনি তার রোগ শয্যাপাশে উপস্থিত হতেন। তার ওজর কবুল করতেন।–বর্ণনায় আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু

সাহাবীদের মজলিসে তাকে কখনো এমনভাবে পা মেলে দিয়ে বসতে দেখা যায়নি, যাতে এ কারণে কারও কষ্ট হয়, জায়গাটি সংকীর্ণ হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে আমি শতবারের চেয়ে বেশি বসার সুযোগ পেয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের দেখেছি, তারা একে অপরের কাছ থেকে কবিতা শুনছেন এবং শোনাচ্ছেন। জাহেলি যুগের কোনো কোনো কথা বা কাহিনীর উল্লেখও করছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চুপ বসে আছেন অথবা কখনো কোনো হাসির বিষয় এলে তিনি মৃদু হাসছেন।

হযরত শুরায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উমাইয়া ইবনুস সালতের কবিতা আবৃত্তি করার আদেশ করলেন। আমি তাঁকে কবিতা শোনালাম।–*আল আদাবুল মুফরাদ*, বুখারীকৃত

হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সীমাহীন পেলব-কোমল অন্তরের অধিকারী, প্রীতিময় আর দয়ার্দ্রচিত্ত মানুষ। মানবিক অনুভূতি এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপলব্ধি তাঁর জীবনীতে অত্যন্ত সুন্দর আর উৎকৃষ্টরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে

ডেকে বলতেন, আমার বালক দু'টোকে ডেকে দাও তো। তারা (হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ছুটে আসতেন। হুযুর তখন তাদের দু'জনকে চুমু খেতেন এবং নিজের বুকের সাথে তাদের চেপে ধরতেন।–*তিরমিযী শরীফ*, মানাকিব পর্ব

একবার হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন। হাসান ছুটে এসে হুযুরের কোলের ওপর লাফিয়ে পড়লেন এবং দাড়ি মোবারকে আঙুল চালাতে লাগলেন। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হাসানের দিকে চেয়ে) হাঁ করলেন। হাসান তখন হযরতের মুখের ভেতর তার ছোট্ট মুখখানা দিতে লাগলেন।–*আল আদাবুল মুফরাদ*, বুখারীকৃত

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, যায়েদ ইবনে হারেসা (হযরতের গোলাম) মদীনায় এল। এ সময় হুযুর বাড়ির ভেতরে ছিলেন। সে বাড়ি এসে দরজায়ে ডাক দিল। তৎক্ষণাৎ হুযুর উঠে গেলেন। সে সময় হুযুরের পরনে পূর্ণ পোশাক ছিল না। চাদরখানা দেহ মোবারক থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে হুযুর তার সাথে মুআনাকা করলেন এবং তাকে চুমু খেলেন।–*তিরমিযী শরীফ*

উসামা ইবনে যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা তাঁকে এ মর্মে সংবাদ দিলেন, আমার বাচ্চার শেষ অবস্থা। হুযুর তখন সেখানে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। হুযুর তাঁর কন্যার নিকট সালাম বললেন। আরও বললেন, যা আল্লাহ নিয়ে গেছেন, তা আল্লাহর; আর তাও আল্লাহর, যা তিনি দান করেছেন। প্রতিটি বস্তুই তাঁর নিকট লিপিবদ্ধ ও সুনির্ধারিত। অতএব, ধৈর্য ধারণ করা এবং সাওয়াব ও প্রতিদানের আশা পোষণ করা উচিত। কন্যা হুযুরকে ভেতরে তাশরিফ নিয়ে যেতে বললেন। হুযুর উঠে পড়লেন, আমরাও সাথে গেলাম। হুযুর তাকে কোলে নিলেন। এ সময় বাচ্চাটির নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠতে লাগল। অবস্থা দেখে হুযুরের নয়নযুগল অশ্রুপাত করতে লাগল। সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা কীসের আলামত? তিনি বললেন, এ হলো দয়া, যা আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য

থেকে যাকে ইচ্ছা করেন, তার অন্তরে ঢেলে দিয়ে থাকেন। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর দয়ার্দ্রচিত্ত বান্দাদের ওপরই দয়া করে থাকেন।–*সহীহ বুখারী*, রোগী পর্ব, ইয়াদাতুস সিবয়ান বা শিশুদের শুশ্রূষা অধ্যায় এবং জানায়েয পর্ব

একজন গেঁয়ো বেদুইন হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আপনারা কি আপনাদের বাচ্চাদের আদর করেন? আমি তো বাচ্চাদের আদর করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের হৃদয় থেকে আল্লাহ তাআলা যদি দয়া-মায়া উঠিয়ে নিয়ে থাকেন, তা হলে তোমাদের জন্য আমি কী করতে পারি!–*সহীহ বুখারী*; হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা আদব পর্ব, সন্তানের প্রতি দয়া অধ্যায়

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের প্রতি অত্যধিক সদয় ও কৃপাময় ছিলেন। তাদের সাথে তিনি সীমাহীন নম্র ও বাৎসল্যপূর্ণ আচরণ করতেন। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, খেলাধুলায় মগ্ন ছেলেদের পাশ দিয়ে হুযুর গেলেন এবং তাদের সালাম করলেন।–*সহীহ বুখারী*, ইস্তিযান পর্ব

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে মিলেমিশে জীবনযাপন করতেন। আমার ছোট ভাইকে তিনি বলতেন, হে উমায়ের, কী হলো তোমার নুগায়ের? (ছোট্ট পাখি। বাচ্চারা এ নিয়ে খেলা করে)–*আল আদাবুল মুফরাদ*

মুসলিম-জাতির জন্য তিনি ছিলেন সীমাহীন করুণার আধার। মুসলমানদের প্রতিটি অবস্থা তিনি খুব গভীরভাবে লক্ষ করতেন। মানব-চরিত্রে সাময়িকভাবে যে বিরক্তি-বিতৃষ্ণা এবং আন্তরিক বিপর্যয় দেখা দেয়, এর প্রতিও তিনি অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে যে ওয়াজ ও নসিহত

করতেন, তা বিরতি দিয়ে দিয়ে হতো, যেন আমরা বিরক্তির শিকার না হই। নামাযের সাথে হুযুরের এত গভীর সম্পর্ক ও এর প্রতি তাঁর নিবিড় আসক্তি থাকার পরও কোনো শিশুর কান্না শুনতে পেলে তিনি নামায সংক্ষেপ করে ফেলতেন। হুযুর নিজে ইরশাদ করেন, আমি নামাযের জন্য দাঁড়াই এবং ইচ্ছা করি দীর্ঘ নামায আদায় করার। তখন কোনো শিশুর কান্না শুনতে পেলে নামায সংক্ষিপ্ত করে দিই, যেন শিশুটির মায়ের উদ্বেগ আর কষ্ট পৌঁছাতে না হয়।–*সহীহ বুখারী*, সালাত পর্ব

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, খোদার কসম, আমি (আমার মহল্লার) ফজরের নামাযে কেবল এ জন্যই উপস্থিত হই না, কারণ, অমুক ব্যক্তি অতিশয় দীর্ঘ নামায পড়ায়। এরপর হযরত ওয়াজ করেছিলেন। এরচেয়ে বেশি রাগান্বিত অবস্থায় আমি তাকে আর কোনো ওয়াজ করতে দেখিনি। হুযুর বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। যারা নামায পড়ায়, তাদের উচিত সংক্ষেপে পড়ানো। কেননা, নামাযীদের ভেতর দুর্বল, বৃদ্ধ ও ব্যস্ত—সব ধরনের লোকই থাকে।–*সহীহ বুখারী*, সালাত পর্ব

এখানে ওই ঘটনাটিও উল্লেখ করার মতো। আনজাশাহ নামক জনৈক ব্যক্তি খুব সুললিত কণ্ঠে উট-চালনার গীত গাইতে পারতেন। তার গীত শুনলে উট খুব দ্রুত চলত। এতে উটে সওয়ারি মহিলাদের কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আনজাশাহর এমন উট-চালনা দেখে বললেন, আনজাশাহ, একটু ধীরে। এ দ্রুত গতিতে উটের ঝাঁকুনিতে কাঁচের পাত্রগুলোর প্রতি একটু সদয় হও।–*আল আদাবুল মুফরাদ* : ১৮৫; *সহীহ বুখারী* ও *মুসলিম*

নারীদের দুর্বলতা ও নাজুকত্বকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁচের ভঙ্গুর পাত্রের সাথে তুলনা করেছেন।

আল্লাহ পাক হযরত রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরকে সব ধরনের সংকীর্ণতা, ক্ষোভ ও অকল্যাণ থেকে পবিত্ররূপে সৃষ্টি করেছিলেন। কারও অহিত ভাবনা তাঁর মনেই আসত না। হযরত বলতেন,

তোমরা কেউ অপর কারও ব্যাপারে আমার নিকট কোনো অভিযোগ করতে এসো না। কারণ, আমি তোমাদের সামনে এভাবে আসতে চাই যে, তোমাদের সকলের ব্যাপারে আমার অন্তর থাকবে নির্ভার ও পরিচ্ছন্ন।–*কিতাবুশ শিফা* : ৫৫, বর্ণনায় আবু দাউদ

মুসলমানদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল একজন স্নেহময় পিতার ন্যায়। গোটা মুসলিম-উম্মাহ যেন তার পরিজন। এদের সবার দায়-দায়িত্ব তাঁর কাঁধে ন্যস্ত। মুসলিম-জাতির সাথে তাঁর সম্পর্ক যেন কোলের শিশুর সাথে স্নেহময়ী মায়ের সম্পর্ক। মুসলিম-জাতির ধন-সম্পদ ও আল্লাহপ্রদত্ত নাজ-নেয়ামতের বিষয়ে হুযুরের কোনো দখল না থাকলেও মুসলিম সোসাইটির অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ঋণের বোঝা আর দেউলিয়াত্বের দায়ভার হযরতকেই বইতে হতো। হযরত বলতেন, (ইসলামী সমাজের) মৃত ব্যক্তির ধন-মাল তার ওয়ারিসানদের। আর তার ঋণ ইত্যাদি আমার দায়িত্বে।–*সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ইসতিকরাজ

অপর এক বর্ণনায় আছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ঈমানদার এমন নেই, যার দুনিয়া ও আখেরাতে আমার চেয়ে বেশি আপন কোনো অভিভাবক আছে। পাঠক, নিচের আয়াতটি পড়ে আপনার হৃদয়ের স্পন্দন হয়তো বেড়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ.

নবী মুসলমানদের জন্য তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় বন্ধু ও ভালোবাসার মানুষ।–সূরা আহযাব (৩৩) : ৬

আর তাই কেউ মারা গেলে, তার সহায়-সম্পত্তি মৃতের আত্মীয়-পরিজন নিয়ে নেবে। আর কোনো কর্জ, পাওনা বা দাবি রয়ে গেলে আমার কাছে এসে নিয়ে যাবে। মৃতের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল আমি।–প্রাগুক্ত

হযরত রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ঘোষণা চিরদিনের জন্যই সত্যিকার ইসলামী হুকুমতের ওপর বর্তায়। মুসলিম-সমাজের বাসিন্দা প্রতিটি নাগরিকের অভিভাবক তার শাসকবর্গ। সরকারি

কোষাগার থেকে নাগরিকদের ঋণ আদায় করার নীতি কেবলমাত্র ইসলামী শাসনব্যবস্থার মাঝেই রয়েছে।

স্বভাবগত মিতাচার ও অনুপম রুচিশীলতা

মহান রাব্বুল আলামিন হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ধরনের উন্নত চরিত্র, সৃষ্টি ও প্রকৃতিগত সুসামঞ্জস্যতা দিয়ে তৈরি করেছিলেন, তা গোটা মানবজাতির অতীত, বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের জন্য এক নিরুপম আদর্শ। হযরতের প্রকৃতিগত ভারসাম্য, মননশীলতা, সুরুচি, অনুভূতির লালিত্য, পূর্ণতা ও ব্যাপ্তি তুলনাহীন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

প্রিয়তমা জীবনসঙ্গীনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ভাষায়— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যখন দু'টো কাজ হতে একটি কাজ বেছে নেওয়ার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি তুলনামূলক সহজ কাজটিকেই নির্বাচন করতেন, যদি এটাতে গুনাহের কোনো লেশ না থাকত। আর গুনাহের সম্ভাবনা থাকলে এ থেকে তিনিই থাকতেন সর্বাপেক্ষা দূরে।–*সহীহ মুসলিম*

হুযুর কৃত্রিমতা, অহেতুক সংকোচ, সীমাতিরিক্ত কৃচ্ছতা এবং নিজেকে বৈধ অধিকার ও সম্ভোগ থেকে দূরে রাখার মতো প্রবণতা থেকে পবিত্র ছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হুযুর বলেছেন, দীন সহজ বিষয়। আর যে ব্যক্তিই দীনের সাথে শক্তির পরীক্ষায় নামবে, দীন তার ওপর বিজয়ী হয়ে যাবে। অতএব, মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং ভারসাম্য বজায় রেখে চলো। নিকটবর্তী জিনিসগুলোর প্রতি খেয়াল রাখো আর উদারতা বজায় রাখো। সকাল, সন্ধ্যা এবং রাতের আঁধারে কিছুটা সময় ইবাদত করে শক্তি অর্জন করে নাও।–*সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ঈমান

প্রিয় নবী এ কথাও বলেছেন, থামো, তোমার যতটুকু সামর্থ্য আছে, ততটুকুই করো। কেননা, শপথ আল্লাহর, আল্লাহ তাআলার তো শ্রান্তি নেই, তোমরাই বরং ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চাওয়া হলো, হযরত, কোন দীনটি আল্লাহ পাকের নিকট বেশি প্রিয়? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সারল্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ দীনে ইবরাহিমী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা যাদের স্বভাব, যারা সূক্ষ্ম বিষয়াদি নিয়ে অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি করে, তাদের জন্য ধ্বংস।–*সহীহ মুসলিম*

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর নেয়ামতের প্রকাশ স্বীয় বান্দাদের মাঝে দেখতে ভালোবাসেন। [এ হাদীসখানা তিরমিযী তার 'আবওয়াবুল আদাবে' বর্ণনা করেছেন]

অর্থাৎ, আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত অনুযায়ী জীবনযাপন করা, আল্লাহর দেওয়া জীবনোপকরণ ব্যবহার করা আল্লাহর পছন্দ। বিত্তবান ব্যক্তির পক্ষে ভিখিরির বেশ ধারণ করা বা অভাবীর ন্যায় জীবনযাপন করা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের না-শোকরিরই নামান্তর। এ হাদীসে এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

সমাপ্ত

তথ্যসূত্র

১. আল কুরআনুল কারীম
২. হাদীসের বিশুদ্ধতম সংকলনসমূহ
৩. আখলাক ও শামায়েল-বিষয়ক স্বতন্ত্র হাদীস সংকলন
৪. *মুসনাদে আহমদ*
৫. *জমউল ফাওয়ায়েদ*
৬. *মাজমাউল বিহার*
৭. *ওসায়েলুল ওসুল ইলা শামায়িলির রাসূল*
৮. *মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক*
৯. বুখারী : *আল আদাবুল মুফরাদ*
১০. কাজী আয়ায রহ.: *শিফা*
১১. আসকালানী রহ.: *ফতহুল বারী*
১২. ১৩. তাফসীর ও তারীখ—লিল ইমামিত তাবারী রহ.
১৪. ইবনে সাদ রহ. : *তাবাকাত*
১৫. *মুসতাদরাকে হাকেম*
১৬. ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যা রহ. : *যাদুল মাআদ*
১৭. ইমাম নববী রহ. : *তাহযীব*
১৮. শায়খ দেহলভী রহ. : *মাদারিজুন নবুওয়াত*
১৯. খাজা শিহাব সোহরাওয়ার্দী রহ. : *আওয়ারেফুল মাআরিফ*
২০. *ওয়াফা আল ওয়াফা*
২১. হযরত থানভী রহ. : *নাশরুত তীব*
২২. শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. : *খাসায়েলে নববী*
২৩. শায়খ দেহলভী রহ. : *জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব*
২৪. আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী : *নবীয়ে রহমত*
২৫. মাওলানা মনযূর নোমানী : *মাআরিফুল হাদীস*
২৬. শায়খ আবু বকর আল জাযায়েরী : *হাযাল হাবীব ইয়া মুহিব*
২৭.: আরেফ বিল্লাহ ডা. আবদুল হাই : *ওসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*
২৮. বদরে আলম মিরাঠি রহ. : *তরজুমানুস সুন্নাহ*
২৯. *শামায়েলুর রাসূল*
৩০. বিভিন্ন ভাষায় সীরাত স্মরণিকা ও প্রবন্ধ সংকলন

রাহনুমা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত
কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ–





ISBN 978-984-92213-4-0 MRP US$4.00
৳ ১৮০.০০
9 789849 221340

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।